সারদা মঙ্গল

বিহারীলাল চক্রবর্তী

গৌরাঙ্গ ভৌমিক সম্পাদিত

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
২৯এ কালী দত্ত স্ট্রীট । কলকাতা ৫

প্রকাশক ॥ অরুণ কুমার দে হাজরা
পাণ্ডুলিপি প্রকাশন ॥ ২৯এ কালী দত্ত স্ট্রীট।
কলকাতা ৫
প্রচ্ছদপট ॥ দিলীপ মুখোপাধ্যায়
জয়ন্তকুমার
ব্লক নির্মান ॥ অজিত রায়
শেঠ বাগান লেন ॥ কলকাতা ৬
মুদ্রাকর ॥ জয়ন্তকুমার গনেরিওয়ালা
কুমার প্রিণ্টার্স ॥ ৫বি মুক্তারামবাবু স্ট্রীট।
কলকাতা ৭

দাম : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা

॥ কবির পত্র ॥

সুহৃদ্বর.

শ্রীযুক্তবাবু অনাথবন্ধু রায়

মহাশয় করকমলেষু।

৫নং অক্ষয় দত্তের লেন,

নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট

কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক, ১২৮৮।

ভ্রাতঃ!

'। মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ—যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি। '

সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিনীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তীকাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্তি রচনান্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী প্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধকরি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।

মৈত্রী-প্রীতিবিরহ যথার্থ সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক হয় এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়। কি করি বলুন, আমাকে কুরুটে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদাপ্রেমের অসর্ববাদিসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।—

অনুরক্ত

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

॥ বিহারীলালের রচনাবলী ॥

১৮৫৮	স্বপ্নদর্শন (গদ্য রূপক কাব্য)
১৮৬২	সঙ্গীত শতক (কাব্য)
১৮৭০	বঙ্গসুন্দরী (কাব্য)
১৮৭০	নিসর্গ সন্দর্শন (কাব্য)
১৮৭০	বন্ধু বিয়োগ (খণ্ড কাব্য)
১৮৭০	প্রেমপ্রবাহিনী (কাব্য)
১৮৭৯	সারদামঙ্গল (কাব্য)
——	সাধের আসন (গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত)

অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড (১৩০৭) ২য় খণ্ড (১৩২০)

॥ বিহারীলাল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ॥

১। সাধনা। আষাঢ় ১৩০১। বিহারীলাল : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। নব্য ভারত। ১৩০১। বিহারীলাল : ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

৩। রহস্য সন্দর্ভ। ৫ম পর্ব ৫৯ খণ্ড। বঙ্গসুন্দরী কাব্যের সমালোচনা (রাজেন্দ্রলাল মিত্র)।

৪। আর্যাবর্ত। কার্তিক ১৩১৮। পুরাতন প্রসঙ্গ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা)—বিপিন বিহারী গুপ্ত।

৫। ভারতবর্ষ। পৌষ ১৩১০। পিতৃতর্পণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথা) —বিপিন বিহারী গুপ্ত।

৬। আর্যাবর্ত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২০। কবি বিহারীলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ।

৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্য : মোহিতলাল মজুমদার।

৮। প্রাক-রবীন্দ্র বাংলা কাব্য : হরপ্রসাদ মিত্র।

৯। সাহিত্য পরিক্রমা : হরপ্রসাদ মিত্র।

১০। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

[এতদ্ভিন্ন উনবিংশ শতকের বাংলা রোম্যান্টিক কাব্য সাহিত্যের যে কোন আলোচনা দ্রষ্টব্য]

॥ বিহারীলাল ॥

উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে বিহারীলালের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মতো বহু-আলোচিত ব্যক্তি তিনি নন; এমন কি জীবিতকালে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা অর্জনেও তিনি সক্ষম হননি। অবশ্য বিহারীলাল কোনদিনই কোনপ্রকার সম্মান বা মর্যাদালাভের সচেতন আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করতেন না। স্বীয় শক্তি সামর্থ সম্পর্কে কবির বিশ্বাস ছিল অগাধ। কবির ঘনিষ্ঠবন্ধু ৺কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন, "তাঁহার (বিহারীলালের) ধ্রুবজ্ঞান ছিল যে, উপস্থিত লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাঁচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে।"

বিহারীলালের সে বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি। মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে নিজেকে বিহারীলালের শিষ্যরূপে ঘোষণা করে জনসমক্ষে তাঁর গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য প্রয়াস পান।

অক্ষয় কুমার বড়াল একটি শোকগীতি রচনা করে বিহারীলালের স্বপ্নপ্রাণ হৃদয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

> এসেছিলে শুধু গায়িতে প্রভাতী,
> না ফুটিতে ঊষা, না পোহাতে রাতি
> আঁধারে আলোকে প্রেমে মোহে গাঁথি,
> কুহরিল ধীরে ধীরে।
> ঘুমঘোরে প্রাণী ভাবি স্বপ্নবাণী, ঘুমাইল পার্শ্ব ফিরে।

রবীন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ অনুরূপ মানসিকতার বশবর্তী হয়েই বিহারীলালকে বাঙলা কাব্য-গগনের "ভোরের পাখি" আখ্যা দান করেন। পরবর্তী কবি-গোষ্ঠীও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেই বিহারীলালের বিচার করেছেন। ফলতঃ এ বিচার খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ। সন্দেহ নেই, উনিশ শতকের ছন্দ-মহাকাব্যের যুগে বিহারীলালের একান্ত আত্মমুখী-চেতনা সমসাময়িক সাহিত্যরুচির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের সূচনা করেছিল। এবং এই অভিনবত্বের সূত্রেই বিহারীলালের স্থান নির্দ্ধারিত। সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে এক বহির্মুখী ভাবপ্রবাহের সজ্ঘাত-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। বিহারীলাল এই অনিবার্য প্রবণতার (কোলাহলের) পাশাপাশি আপন হৃদয়ে সংহত নিঃসঙ্গতার বেদনা-বিষণ্ণতাকে কাব্যভাষা

দান করলেন। (অনেকে এই ঘটনাটিকে প্রাধান্য দিয়ে বিহারীলালকে বাঙলা গীতিকাব্যের স্রষ্টারূপে অভিহিত করে থাকেন।)

প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য, বাঙলা কাব্যের ঊষালগ্নেই গীতিকবিতার অস্ফুট অনুরণন শোনা গিয়েছিল। বিহারীলালকে এই ধারার একক ও প্রথম স্রষ্টারূপে স্বীকৃতি দিলে চর্যাপদ ও বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। বস্তুতঃ বিহারীলাল বাঙলা গীতিকাব্যের স্রষ্টা নন, তবে প্রথম সচেতন শিল্পী, যিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর বেদনা-বিষণ্ণতার নিখাদ সঙ্গীত উচ্চারণ করলেন। তাঁর পূর্বে আর কোন কবির কাব্যে প্রাণের এমন নিরাবরণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়নি।

কোন কোন সমালোচকের মতে, উনিশ শতকী ছদ্ম-মহাকাব্যিক আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াতেই বিহারীলালের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বিহারীলালের নিম্নোক্ত কয়েকটি পংক্তি প্রায়শঃ ব্যবহার করে থাকেন।

এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই
গোরে বসে অট্টহাসে কে রে কার ছায়া?
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উল্কিমুখী আয়া।

... ...

কেন এই অলীক ভূষা সরস্বতী অকলুষা
এই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে।
হেলিয়া নলিনী রাণী কোন প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটি মালা দিব শ্রীচরণে?
দু'মিনিটে ঝরে যাবে মরে যাবে প্রাণী।
দিব না মায়ের পায়ে প্রসাদী কুসুম আনি।

বিহারীলালের এই বেদনাগর্ভ অভিযোগ কি সম্পূর্ণ ক্লাসিক-কাব্যের প্রতিক্রিয়ার ফল? সন্দেহ জাগে, সমকালীন পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাহিত্যিক-মানসিকতার প্রতিক্রিয়াতেই এর সৃষ্টি। বরং নিঃসন্দেহে, একে কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতিক্রিয়া না বলে সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া বলাই অধিকতর সমীচীন।

(বিহারীলাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল কাব্যরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির অনেকগুলিই তাঁর ভালভাবে পড়া ছিল। সেই পরিচয়-সূত্রে ক্লাসিক কাব্যের প্রতি বীতরাগ হয়েই তিনি রোমান্টিক গীতিকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, এমন কথা যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। কারণ, রোমান্টিক ও ক্লাসিক—মানব-মনের দুই বিপরীত বৃত্তি নয়। পৃথিবীর সব সাহিত্যেই উভয় রীতির সহাবস্থান বহুবার লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষতঃ বাঙলা সাহিত্যে এই

উভয় রীতির সুস্পষ্ট যুগব্যবধান নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তথাকথিত মহাকাব্যের যুগের প্রধান কবি মধুসূদনের হাতে 'ব্রজাঙ্গনার' মতো কাব্য এবং চতুর্দ্দশ পদাবলীর মতো কবিতাও লিখিত হয়েছে। তবে সব দেশের সাহিত্যেই কখনও ক্লাসিক, কখনও রোমান্টিক চেতনা প্রাধান্যের একাধিক নজীর আছে। সেদিক থেকে উনিশ শতকের বহু আলোচিত এই কয়েক দশককে ক্লাসিক-প্রাধান্যের যুগ বলা যায়। এই ক্লাসিক-প্রাধান্যের যুগে বিহারীলাল স্ব-ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আপন হৃদয়ের স্বগত সঙ্গীত কোমল সুরের ঝর্ণাধারায় গেয়ে গেলেন। আর সৌন্দর্যমুগ্ধ রহস্যাভিসারী কবিপ্রাণের সেই সুরে পরবর্তী কবিরাও আপন বীণার তার চড়ালেন। ফলতঃ বিহারীলালের ধারাই জয়যুক্ত হল।

২

কাব্যের বিচারে কাল-পরিবেশের আলোচনা প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। বাঙলা দেশের একাধিক মনীষী সেই সঙ্গে কবিকে জানবারও পরামর্শ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদা ঈশ্বর গুপ্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "কবির কবিতা বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।"

ঋষি-বাক্য উপেক্ষা করি সেরূপ সাধ্য নেই। কবিতার প্রয়োজনে কবিকে না বুঝলে ক্ষতি হবে এমন কথাও সব সময় স্বীকার করতে পারিনে। কবিকে বুঝবার প্রয়োজন আছে। তবে তা অন্যবিধ। কি প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন—তা জানার প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করবে? কবি ও সাহিত্যিকেরা পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করার নিরন্তর সাধনাই করে যান, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন না। বিহারীলালের কাব্য-আলোচনার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি বিচার-প্রসঙ্গে কবিকেও জানবার আবশ্যকতা স্বীকার করতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে, বিহারীলালের কবিপ্রাণের অভিব্যক্তি কাব্যরূপে যতখানি প্রকাশিত, ততোধিক অপ্রকাশিত। বিহারীলাল নাকি কবিত্বে সর্বদাই মসগুল হয়ে থাকতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের দ্বারা বিহারীলাল একই সঙ্গে নিন্দিত ও প্রশংসিত। যাঁরা বিহারীলালের কাব্যবিচার করেন, তাঁদের নিকট এরূপ সতর্কতাবাণীর প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে, অপরদিকে কবি-হিসেবে তাঁর প্রকাশ-ব্যর্থতার কথাও এতে স্বীকৃত। বিহারীলাল যত বড় কাব্যকার, তার চেয়ে অনেক বড় কবি-একথা প্রমান ও আলোচনা সাপেক্ষ। কবিতা পাঠ করে উপযুক্ত রস-গ্রহণ করতে না পেরে কবির দ্বারস্থ হতে হলে পাঠকের বড় দুর্ভোগ। রবীন্দ্রনাথ "নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, "একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব

আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি।……এমন কি নীরব কবি বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে ও সেকথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এতদূর পর্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে নীরব কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়।" রবীন্দ্রনাথ আরও কঠোর মন্তব্য করেছেন, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মত নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

বিহারীলালের কাব্যবিচারে কবির প্রকাশগত কুণ্ঠা ও চিন্তাগত জটিলতার দিকে তাকিয়ে সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবিকে বুঝবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও অনুরূপ কারণেই (ঈশ্বরগুপ্ত প্রসঙ্গে) কবিকে বুঝলে "গুরুতর" লাভের প্রলোভন দেখিয়েছেন। ক্রোচে **expression** এবং **intuition**-কে স্বতন্ত্র করে দেখেন নি। বর্তমান আলোচনায় আমরাও তাই কবিকে নেপথ্যে না রেখে কবি-জীবনের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি।

৩

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের এক গলিতে (বর্তমান 'বিহারীলাল চক্রবর্তী লেন') বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষের আদি বাস ছিল চন্দননগরে (ফরাসডাঙায়) এবং বংশগত উপাধি চট্টোপাধ্যায়। তখনকার দিনে নিম্নবর্ণের দান গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণকে সমাজে পতিত হতে হতো। কথিত আছে, বিহারীলালের প্রপিতামহ জনৈক সুবর্ণ বণিকের দান গ্রহণ করে পতিত হন এবং বাধ্য হয়ে আদিবাস ত্যাগ করে কলকাতায় স্থায়ী বাস পরিবর্তন করে সুবর্ণবণিক সমাজের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। এই পাতিত্যের দোষেই নাকি বিহারীলালের পিতৃব্য দ্বারকানাথ অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করতে পারেননি।

পিতামহের মৃত্যুর পর বিহারীলালের পিতাও সুবর্ণবণিক সমাজের পৌরোহিত্য করে সংসার প্রতিপালন করতেন। বিহারীলাল পিতামাতার তৃতীয় পুত্র-সন্তান। প্রথম দুই পুত্র শৈশবেই লোকান্তরিত হওয়ায় বাল্যে বিহারীলাল ঠাকুরমার অত্যধিক যত্নে-আদরে বেশ দুরন্ত হয়ে ওঠেন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলাল মাকে হারালেন। তখন তার বয়স মাত্র

চার বৎসর। বালক হৃদয়ে মাতৃ-স্মৃতি তখনও স্থায়ীরূপ লাভ করেনি। শৈশবের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের স্মৃতি কখনও অস্পষ্ট, কখনও অর্ধ-স্পষ্টরূপে বিহারীলালের কবিহৃদয় আনন্দে, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় নিত্য ক্রিয়াশীল ছিল। 'সাধের আসন' কাব্যের 'নিশীথে' কবিতায় কবি স্বীয় মাতৃ-স্মৃতিকেই পুনরায় স্মরণ করেছেন।

বালক বয়সে বিহারীলাল পাঠের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁর পিতাও পুত্রের অধিক বিদ্যা প্রত্যাশা করতেন না। কারণ, সামান্য সংস্কৃতজ্ঞানেই পৌরোহিত্যের কাজটা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সেইজন্যে, বাল্যকালের শিক্ষা তাঁর গৃহেই সমাপ্ত হয়।

কৈশোরে তিনি কিছুদিন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে' (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজে) অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং কিছুদিন মুগ্ধবোধ অধ্যয়ন করেন। পরে নিজের চেষ্টায় এবং বন্ধু কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় কবি বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী কাব্য-নাটক অধ্যয়ন করেন। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তর চরিত, শকুন্তলা (মনিয়ার উইলিয়মস প্রকাশিত), বায়রণের চাইল্ড হ্যারাল্ড, শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিংলিয়র প্রভৃতি গ্রন্থ যুগ্ম-প্রচেষ্টায় পঠিত হয়।

বিহারীলাল তাঁর কাব্যসমূহে প্রায়শঃ ইংরেজী কবিতার পংক্তি-বিশেষ সর্গারম্ভে ব্যবহার করেছেন। সমকালীন ও কিঞ্চিৎপূর্ববর্তী কবিদের অনেকেই য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় স্কট-মুর-বায়রনের রোম্যাণ্টিক আখ্যান কাব্যের প্রভাব, মাইকেলের রচনায় মিল্টনের (হোমার-ভার্জিলের) মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য্যের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। নবীন সেন প্রচুর বায়রণ পড়া-শোনা করেও সবকিছুকে বাঙালী ধাঁচে ঢালাই করেছেন। বিহারীলালের সমসাময়িক অন্যান্য কবিগোষ্ঠী শেলী-ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনার সঙ্গেও ঘনিষ্ট-ভাবে পরিচিত ছিলেন। বিহারীলালের কাব্যে ইংরেজী উদ্ধৃতি দেখে ইংরেজী কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও মানস-প্রবণতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

সেই সময়ে বাঙলাদেশের সর্বত্র নিয়মিত কবিগানের আসর বসত। বিহারীলাল প্রায়শঃ সেই সব আসরে যেতেন। কবিগানের প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিহারীলালের বাল্যকৈশোরের দিনগুলিকে মোহময় করে তুলেছিল। অনেক সময় তিনি ভুলে-যাওয়া গানের পাদপূরণ করে আনন্দ পেতেন। সম্ভবতঃ তখন থেকেই শিশুপ্রাণে কবিতার মৃদু ঝঙ্কার অনুভূত হয়েছিল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলাল বিবাহ করেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। চার বৎসর যেতে না যেতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। পত্নীর মৃত্যুতে কবি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

নিতান্ত বালক বয়সে মায়ের মৃত্যুতে যে শোক তিনি পেয়েছিলেন, যুবক বয়সে পত্নীর মৃত্যুতে ততোধিক আঘাত আবার সইলেন। এই শোকের স্মৃতি বন্ধু বিয়োগ কাব্যে লিপিবদ্ধ আছে।

জগতে কোন শোক বা আঘাতই চিরস্থায়ী হয় না। শোকের আঘাত কিছুটা প্রশমিত হলে দুই বৎসর পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলাল কাদম্বরী দেবীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কাদম্বরী দেবী কবির যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি বিহারীলালের কাব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন। বিহারীলাল তাঁকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বহু কাব্য-রস পান করে সুখের নীড়ের সন্ধান পান। বিহারীলালের কাব্যে এই পত্নীপ্রেমের প্রসঙ্গ অত্যন্ত মধুর। কাদম্বরী দেবী তাঁকে গার্হস্থ প্রেমের এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভবের সন্ধান দেন। বঙ্গসুন্দরী কাব্যের নবম সর্গটি পত্নীপ্রেমের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল।

কাদম্বরী দেবীর সাথে বিবাহের এক বৎসর পূর্বে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কামাখ্যাচরণ ঘোষের 'পূর্ণিমা' প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্টসূত্রে জড়িত হন। বিহারীলালের অনেকগুলি কবিতা পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়। নানা অসুবিধার জন্য পত্রিকাটি দীর্ঘজীবী হয়নি। কিছুকাল চলবার পর পূর্ণিমা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সঙ্গীত শতক" প্রকাশিত হয়। সম-সাময়িক ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাবও এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, "বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার যে ধারাটি নিধুবাবু, শ্রীধর কথক. রাম বসু প্রভৃতির প্রণয় সঙ্গীতে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা বিহারীলাল নূতন খাতে বহাইয়া দিলেন সঙ্গীত শতকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পুরানো গীতি-কবিতার সহিত শেষভাগের নূতন গীতিকবিতার অখণ্ড সংযোগের সাক্ষ্য দিতেছে বিহারীলালের এই প্রথম গান-কবিতার বইটি। সুর-তালের নির্দ্দেশ থাকিলেও ঠিক গানের ঠাটে বাঁধা নয়। যেগুলি গানের ঠাটে বাঁধা সেগুলির ভাবে-ভঙ্গিতে প্রায়ই নিধু-শ্রীধর প্রভৃতির রচনার প্রতিবিম্বন আছে। আর যেগুলি দীর্ঘতর রচনা এবং গানের ঠাটে বাঁধা নয় সেগুলিতে বিহারীলালের পরবর্তী গীতিকবিতার পূর্বাভাস আছে।"

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে "সাহিত্য-সংক্রান্তি" নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটিতে বিহারীলালের "নভোমণ্ডল", "প্রেম প্রবাহিনী কাব্য", "পল্লীগ্রাম ভ্রমণ" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বিহারীলালের সাথে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে "অবোধ বন্ধু" নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল প্রথমে এর প্রধান লেখক ও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। প্রথম পত্রিকাটির আয়তন ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিহারীলাল সম্পাদক ও সত্বাধিকারী হওয়ার পর এর কলেবর বৃদ্ধি পায়। এতে বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' কাব্যের কয়েকটি কবিতা, 'বঙ্গ সুন্দরী' কাব্য, এবং 'সুরবালা' ও 'প্রেমবাহিনী'র কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'অবোধ বন্ধু' বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাটিকে নানা কারনে গুরুত্বদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, "বঙ্গদর্শনকে" যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাত সূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রভাতের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ বিহারীলালের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই বৎসর বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী," "নিসর্গ সন্দর্শন," "বন্ধুবিয়োগ" ও "প্রেম প্রবাহিনী" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।' এই সময়ে বিহারীলাল তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য "সারদামঙ্গল" লেখা শুরু করেন।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের পিতৃবিয়োগ ঘটে। জীবনের এই দীর্ঘকালটা তিনি একপ্রকার সুখেই কাটিয়েছিলেন। কোনপ্রকার আর্থিক চিন্তা তাঁকে কখনও করতে হয়নি। এবার সেই অর্থচিন্তাটাও এল। এ সময়ে কবির এক বাল্যবন্ধু বাঙলাদেশে কাশ্মীরী রেশম আমদানীর ব্যবসা সুরু করেন। বিহারীলাল কিছুকাল এই ব্যবসায়ে যুক্ত থেকে একে অসম্মান-জনক মনে করেন এবং পিতার ন্যায় সুবর্ণবনিক সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "ভারতী" প্রকাশিত হয়। বিহারীলাল পত্রিকাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গে সূত্রে জড়িত হয়ে পড়েন। ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁর পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। এবার সেই পরিচয় আরও গভীর হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমকালীন বিহারীলালের সুন্দর আন্তরিকতা পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন, "তাহাকে দেখিলেই মনে হইত খাঁটি কবি। সর্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।......যখন কোনও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা হইত, অথবা গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে তাহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিত, তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন।"

বিহারীলালের সর্বশেষ কাব্য "সাধের আসন।" এই কাব্যটি রচনার পশ্চাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর প্রেরণা আছে। বিহারীলাল সেই প্রেরণার কথা "সাধের আসনের" ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলাল দেহত্যাগ করেন।

৪

বিহারীলালের জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর প্রথম জীবনটা কেটেছিল কবিগান, জারি, সারি, টপ্পা প্রভৃতির অসংস্কৃত কাব্যিক

পরিবেশে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ রসহীন, সুরহীন সাহিত্যিক গদ্যের পৌনঃপুনিক অনুশীলনের কাল। তারপর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাঙলাসাহিত্যের অন্তঃসলিলা রসধারা নব নব পথে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে;

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের 'স্বপ্নদর্শন' কাব্যের সূত্রপাত হয়। সমকালে, (একই বৎসরে) রচিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপখ্যান" (কাব্য), হরচন্দ্র ঘোষের "কৌরব বিয়োগ" (পৌরানিক নাটক), রামনারায়ণ তর্করত্নের "রত্নাবলী" (সংস্কৃতানুবাদ), তারকচন্দ্র চূড়ামণির "সপত্নী" (নাটক) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের "সাবিত্রী-সত্যবান" (নাটক)।

১৮৫৯ থেকে' ৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামদাস সেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বহু অনুবাদ ও মৌলিক কাব্য-নাটক-প্রহসন রচনা করেন। এই সময়ের মধ্যে মাইকেলের যুগান্তকারী সৃষ্টি "মেঘনাদবধ" কাব্য (১৮৬১) রচিত হয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিহারীলালের "সংগীত শতক" গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। প্রায় সমকালে ও পরবর্তী কয়েক বৎসরে মধুসূদনের 'বীরঙ্গনা কাব্য,' রঙ্গলালের 'কর্মদেবী,' কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাচার নকসা," দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী" গনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিত্ত সন্তোষিনী" (কাব্য), "ঋতুদর্পন" (কাব্য) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বীরবাহু কাব্য," হরচন্দ্র ঘোষের "চারুমুখচিত্তহরা" নাটক (ইংরাজীর অনুবাদ), বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" বনোয়ারীলাল রায়ের "জয়াবতী" (ঐতিহাসিক কাব্য), প্যারীচাঁদ মিত্রের "যৎকিঞ্চিৎ" (নকশা) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় জোয়ার এল। বিদেশী রোমান্টিক কাব্য সাহিত্যের মতো এই কয়েক দশকের কবি-সাহিত্যিকরা প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যের নবরূপ দিতে চেষ্টিত হলেন। অনেকে মহাভারতের কাহিনীর নবরূপ দিতে শক্তি-সামর্থ ও প্রতিভা নিয়োগ করলেন। এবং এইকালের মধ্যেই রোমান্টিক কবিতার মৃদু টুং টাং ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

এই সময়ে বাঙালির জাতীয় জীবনেও এক সর্বাত্মক কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে "হিন্দুমেলা" প্রবর্তিত হয়; ১৮৮১ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ন্যাশানেল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়; নীলচাষী বিদ্রোহ জনমানসে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ইণ্ডিয়ান লীগ, ভারত সভা ও ভারতীয় বিধানসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই দেশব্যাপী আবেগ চাঞ্চল্যের মধ্যে গীতিকবিতার সুস্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব ছিল না।

কিন্তু মানবমনের গতি-প্রকৃতি বিচিত্র। এই সময়ের মধ্যেই রোম্যান্সের স্বপ্নলোকে বাঙালি পুরাণ ও ইতিহাস চেতনাকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু মানুষের অন্তর্মুখীন চিন্তাধারা এই বাহ্যিক অস্থিরতার মধ্যে কোন তৃপ্তি লাভ

করতে পারে না। তাঁর নিসঙ্গতার বেদনা সংগীতরূপে রোম্যান্স ও আদর্শ-বাদের কল্পলোকে মুক্তি পেতে চায়। উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ঘনান্ধকারের মধ্যে কবির মনে বিষণ্ণতার ক্লান্ত-কোমল রাগিনী শোনা গেল। এই সুর যুগের, এই স্বর যন্ত্রণার। এই মনোভাবকে ইংরাজীতে বলা হয় Romantic melancholy. মিল-এর dejection এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের despondency এই বিষাদের ফল। জার্মান কবি হাইনে, ইংলণ্ডের বায়রণ, শেলী এবং ইতালীয় লিওপার্দি প্রমুখ সকলেই হতাশার বাণীকে রূপ দিয়ে গেছেন। অবশ্য, রোম্যান্টিক বিষাদের আরও গূঢ়তর কারণ আছে। কবির সীমাবদ্ধ বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা, রূঢ়তা, দীনতা ও কুশ্রীতা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ক্ষণস্থায়ী ক্লান্ত পক্ষবিস্তারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা রোম্যান্টিক কবিমনের বিশেষ লক্ষণ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিহারীলালের মধ্যেই প্রথম এই রোম্যান্টিক আর্তি সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করল। কল্পিত আদর্শ ও সৌন্দর্যের জন্য কবিপ্রাণের ব্যাকুলতা ও হাহাকার বিহারীলালের চিত্তলোককে অনাবৃত রহস্যময় জগতে বিচরণের সুযোগ দিল।' পরবর্তীকালে বিহারীলালের শিষ্য ও অনুবর্তীদের রচনায় এই গীতিধারা শতমুখী হয়ে উঠেছে।

[প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা পুনরায় বলা প্রয়োজন, বাঙলা সাহিত্য চিরদিনই গীতিকবিতার ধারায় প্রবাহিত। বিহারীলাল সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিচার বিশ্লেষণ যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ উনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। বস্তুতঃ বিহারীলাল উনিশ শতকী গীতিকবিতার প্রথম সুস্পষ্ট রচয়িতা হলেও বাঙলার মধ্যযুগীয় আউল-বাউল সংগীতের মধ্যেও সেই ব্যক্তিপ্রাণের নিরাবরণ ব্যাকুলতা. অ-ধরাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে।]

৫

এবার আমরা পরবর্তী সাহিত্যে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের ওপর বিহারীলালের চিন্তা ও চেতনা কিভাবে সঞ্চারিত হয়েছে—তা নির্ণয় করবার চেষ্টা করব।

বিহারীলাল নশ্বর দেহ ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা অবিনশ্বর হয়ে বেঁচে রইল। কবির মৃত্যুর পরে অক্ষয় কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন বিহারীলালের প্রদর্শিত পথেই ভাব-তন্ময় কাব্যসাধনায় নিয়োজিত হলেন। অক্ষয় কুমার বড়াল বিহারীলালের মৃত্যুর পর যে শোককাব্য রচনা করেন তাতে তিনি নিজেকে বিহারীলালের শিষ্যরূপে ঘোষণা করেন। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে (রবীন্দ্রনাথও নিজেকে বিহারীলালের শিষ্যরূপে স্বীকৃতি দেন। বস্তুতঃ বিহারীলাল রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর শুধু গুরু নন, তিনি এই ধারার অন্যতম পথিকৃৎরূপে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।)

বিহারীলালের ভাবতন্ময়তা, আত্মবিস্মৃতি, প্রীতিমুগ্ধতা অক্ষয় বড়ালের কবিমানসেরও বৈশিষ্ট্য। বিহারীলাল যেমন ভাব থেকে রূপে, রূপ থেকে ভাবে নিরন্তর আসা-যাওয়া করেছেন, অক্ষয়কুমারের মধ্যেও সেই নিরন্তর গমনা-গমনের বিষাদ-ব্যাকুলতা লক্ষণীয়। অক্ষয় বড়ালের 'ভুল' কবিতার

নিম্নোক্ত পংক্তিগুলি পড়তে পড়তে বিহারীলালের "তবে কি সকলি ভুল! নাই কি প্রেমের মূল" ইত্যাদি পংক্তিগুলি মনে পড়ে। বিহারীলালের অনুসরণে অক্ষয় বড়াল লিখেছেন :—

অচেনা জগৎ-বুকে অবরুদ্ধ সুখে-দুঃখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া!
না লয়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত
ফেলেছি, ঝটিকা মত, না জানি কি তুলিয়া!
রবি, এও কি হয়েছে ভুল, এত ভুলে ভুলিয়া?

দেবেন্দ্রনাথ সেন রূপমুগ্ধ কবি। তবু তাঁর মধ্যে বিহারীলালের প্রেম-বিহ্বলতা, আত্মতন্ময়তা দুর্লক্ষ্য নয়। বিহারীলালের আত্মবিস্মৃত কবিপ্রাণের অদৃশ্য ঝঙ্কার দেবেন্দ্রনাথের কবিমানসকেও তরঙ্গিত করেছে। প্রীতি-বিভোর দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এই ভাঙা দেহ মাঝে (একি গো তামাসা!)
ঢালিয়াছে একরাশ প্রীতি-ভালবাসা!
কবিত্বের অহঙ্কার হয়েছে মা চুরমার
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-পারাবারে।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-কৈশোরের রচনায় বিহারীলালের কবি-মানসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে বিহারীলালের শুধু ভাব নয়, ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন "বিশ্বভারতী" পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮) লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "শুধু ছন্দোবন্ধ নির্বাচনে এবং স্তবক গঠনে নয়, প্রকৃতির খেদ কবিতায় ভাব-পরিবেশ রচনাতেও সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গের গোড়ার দিকের কয়েকটি স্তবকের কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। দুটি রচনাকে পাশাপাশি রেখে পড়লে একথা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, একটা আর একটির সোজাসুজি অনুকরণ না হলেও সারদামঙ্গলের ভাবকল্পনার আদর্শেই প্রকৃতির খেদের ভাব পরিবেশ উদ্ভাবিত হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের নিজের স্বীকৃতি থেকেও এর সমর্থন মিলবে, "বর্তমান সমালোচক (রবীন্দ্রনাথ) এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল।"

বঙ্গসুন্দরীর তিনমাত্রা-মূলক ছন্দ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছয় মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের মূলে বঙ্গসুন্দরীর ছান্দিক প্রভাব আছে। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।......এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।" (সন্ধ্যাসংগীত। জীবনস্মৃতি)। বাল্মীকি প্রতিভা গীতি নাট্যের প্রথম সর্গে রবীন্দ্রনাথ সরস্বতীর বর্ণনায় বিহারীলালকেই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সে ঋণের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বাল্যকালে বাল্মীকি

প্রতিভা নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া বিদ্বজ্জন সমাগম নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। ……সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভ ভাগ হইতে গৃহীত।"

সারদার উদ্দেশে বিহারীলালের বিনীত প্রার্থনা :

এস মা করুণা বাণী ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার,
শুনে সে উদার কথা জুড়াক মনের ব্যথা
এস আদরিনী বাণী সম্মুখে আমার।

বাল্মীকি প্রতিভায় সরস্বতীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা :

হৃদয়ে রাখ গো দেবি, চরণ তোমার।
এস মা করুণা বাণী, ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিনী বাণী সম্মুখে আমার।

বিহারীলাল অন্যত্র লিখেছেন :

যাও লক্ষ্মী অলকায়
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ যোগীজন তপোবন-স্থলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়
এ বনে এস না, এস না,
এস না এ দীন জন কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ হয়ে আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহিনা।

উভয়ের রচনার এই যে সাদৃশ্য তা শুধু মানস গত নয়, এ মিল ভাষা ও ভঙ্গিগত। অবশ্য এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রাক-মানসী পর্ব পর্যন্ত যতখানি ক্রিয়াশীল, পরবর্তী কাব্যে ততখানি নয়। কড়ি ও কোমলে এসে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী "রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর" গ্রন্থে লিখেছেন, "মাইকেল-হেমচন্দ্রের ঘটনাপ্রধান বহির্মুখী মহাকাব্য; বিহারীলালের ঘটনাবিরল, গীতিপ্রধান, অন্তর্মুখী দীর্ঘকাব্য; এই দুইয়ের আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে কাহিনী কাব্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিল। অবশ্য মাইকেল-হেমচন্দ্র অপেক্ষা বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবই তাঁহার কাহিনী কাব্যে অনেক বেশি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রাক-মানসী পর্বের কাব্য—কবিকাহিনী (১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০) ভগ্নহৃদয় (১৮৮১) বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২) কালমৃগয়া (১৮৮২) প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩) শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪) ছবি ও গান

(১৮৮৪) কড়ি ও কোমল (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রভাব নানাভাবে ও রূপে লক্ষ্য করা গেছে। বিহারীলালের অতীন্দ্রিয়তা, সৌন্দর্যানুসন্ধান, ধ্যানমগ্নতা প্রসন্নতা, বিষাদ ও প্রকৃতি প্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণে এক অভূতপূর্ব রসাস্বাদের সন্ধান দিয়েছিল। বিহারীলালের বিষাদ রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতি উপভোগে অতৃপ্তি আর অস্বাচ্ছন্দ এনে দিয়েছে। "শৈশব সংগীতে" রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃত স্বপনবেশে পরাণের কাছে এসে
আধ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

বনফুলের প্রকৃতি-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সারদামঙ্গলকে অনুসরণ করেছেন। বিহারীলালের নির্ঝর-বর্ণনা—

ফেলিল সলিল রাশি
বেগভরে পড়ে আসি
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে।
সুধাংশু প্রবাহধারা
শত শত ধারা ধারা
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে।
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে
ফেনার আরশি উড়ে
উড়িছে মরাল যেন হাজার হাজার।

'বনফুল' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

আজিও পড়িছে ঐ সেই সে নির্ঝর,
হিমাদ্রির বুকে বুকে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ছুটে ছুটে
সরসীর বুকে পড়ে ঝর ঝর ঝর।
কুটীর তটিনী তীরে
লতারে ধরিয়া শিরে
মুখচ্ছায়া দেখিতেছে সলিল দর্পণে
হরিণেরা তরুছায়ে
খেলিতেছে গায়ে গায়ে
চমকি হেরিছে দিক পাদ পঙ্ক জলে।

সারদামঙ্গল সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বন্দনা গানে সমাপ্ত। এই কাব্যে বিহারীলালের

রোম্যান্টিক মানস সঠিক অনুভবে উত্তীর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রাণেরও অনুরূপ উত্তরণ লক্ষ্য করা।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কবিতার সঙ্গে বিহারীলালের সারদার অন্তর্গূঢ় ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। স্বর্গীয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের ওপর বিহারীলালের সারদার প্রভাব নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন, "মানসীর যুগ হইতেই রবীন্দ্রনাথ এই অনন্ত রহস্যময়ী সম্বন্ধে একটু একটু করিয়া সচেতন হইয়া উঠিতেছিলেন। 'সুরদাসের প্রার্থনার ভিতরে সুরদাসের রূপে নিজেই সৌন্দর্যরূপিনী বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট তাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। দেবীর যে বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে, বহির্বিশ্বে খণ্ড খণ্ড তাহাকেই কবি তাঁহার মানসনেত্রে সীমাহীন-রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। মেঘদূতের ভিতরে কবি কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে সৌন্দর্যের আদিসৃষ্টি প্রিয়তমার নিকট তাহার কল্পনার মেঘদূত পাঠাইতে চাহিয়াছেন। সোনারতরীর এই বিশ্বসুন্দরীকে দেখিলাম কবির মানস সুন্দরীরূপে।.........এইরূপে যে সৌন্দর্যরূপিনী জীবনের প্রভাতে ছিল খেলার সঙ্গিনী, যৌবনের বসন্তে প্রেমের অরুণরাগে মধুর হইয়া সে দেখা দিয়াছিল মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-রূপে।...চিত্রা কাব্যের আবেদন কবিতার মহারাণীও সারদার প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন যে, উর্বশীর পরিচয় ভাঙাচোরা ভাবে আছে সকল নারীর ভিতরে, সারদার পরিচয় তেমনই ভাঙা-চোরা ভাবে ছড়াইয়া আছে চিত্রার বহু কবিতার ভিতরে। জ্যোৎস্নারাত্রে, পূর্ণিমা প্রভৃতির ভিতর দিয়া দিয়া কবি দেখাইয়াছেন সারদার সৌন্দর্যলক্ষ্মী মূর্তি; সাধনার ভিতরে সেই সারদা বন্দিত হইয়াছেন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে, উর্বশীতে বিশ্বসৌন্দর্যের আভাস এখানে-সেখানে আসিয়া পড়িতে চাহিলেও এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে, পরিপূর্ণ নারী সৌন্দর্যের ভিতরে সারদার আংশিক পরিচয়। আবার বিদেশিনী কবিতায় দেখিতে পাই, সারদা দেখা দিয়াছে শুধু বিশ্বের অন্তর্নিহিতা মায়াময়ী রহস্যমূর্তিরূপে, সে শুধু তাহার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়াই চলিয়াছে কিন্তু কিছুতেই আত্মপরিচয় দিতে চাহিতেছে না।" বিহারীলাল লিখেছেন—

কায়াহীন মহাছায়া বিশ্ব বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী রূপিনী
অসীম কানন তল ব্যেপে আছে অবিরল
উপরে উজলে ভানু ভূতলে যামিনী।

'চিত্রা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।

উভয় কবির মধ্যে কিছুটা ভাবসাদৃশ্য হয়ত আছে—তবে বৈষম্যটাও

দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই মিলকে আর বিহারীলাল প্রভাবিত বলা যায় না। একই রোম্যান্টিক ভাবনাসূত্রে গ্রথিত হওয়ায় উভয় মানসিকতার প্রকাশে আকস্মিক ও অনিবার্য সাদৃশ্য কখনও কখনও দেখা যাওয়া সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্যকৈশোরের রচনাগুলি বাদ দিলে অন্যত্র বিহারীলালের কোন সচেতন প্রতিফলন নেই। 'কড়ি ও কোমলের' ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন, "আমাদের পরিবারের এক বন্ধু কবি বিহারীলালকে ছেলেবেলা থেকে জানতুম এবং তাঁর কবিতার রীতি ইতিপূর্বেই আমার রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্খলিত হয়ে গিয়েছিল।" সুতরাং ৺শশিভূষণ দাশগুপ্তের বিশ্লেষণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে আমরা কবির কথাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করলুম।

॥ সারদামঙ্গলের কথা-বস্তু ॥

সবশেষে আমরা এবার সারদামঙ্গলের সর্গ অনুসারে কথাবস্তুর পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। অন্যথায় এ ভূমিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একটি সংস্কৃত শ্লোক শিরে ধারণ করে 'সারদা মঙ্গল' প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্লোকসূত্রে অনুমান হয়, মিলনের চাইতে বিরহের প্রতিই কবির আকর্ষণ অধিক। কারণ, বিরহের মধ্য দিয়েই কবি বিচিত্ররূপিনী সারদাকে অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। উপহার সংগীতটির মধ্যেও কবির একই আকুতি লক্ষ্য করা যায়।

॥ প্রথম সর্গ ॥

প্রকৃতির সঙ্গে বিহারীলালের চিরদিন প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক। উষার অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে কবির সারদা অভিন্ন সত্তায় পাঠকের সম্মুখে বিরাজমান। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সূর্য উঠছে, জনপ্রাণী জাগছে। প্রকৃতির বাহ্যিক দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্যাবেদন কবির অন্তরানুভূতির সাথে অভিন্ন ও অনিবার্যসূত্রে গ্রথিত। কবি অন্তরে তমসা নদীর তীরবর্তী বাল্মীকির তপোবনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। ভাবভোলা মুনি বাল্মীকি ভ্রমণ করছেন। এমন সময় নিষ্ঠুর নিষাদের বানে নিহত রুধিরাপ্লুত ক্রৌঞ্চের চারিদিক ঘিরে ক্রৌঞ্চীর করুণ ক্রন্দনে মুনির অন্তরেও শোক সঞ্চারিত হল। এই আকস্মিক আঘাতে করুণ-হৃদয় মুনির কণ্ঠে শোক-সঙ্গীত উচ্চারিত হল। বাল্মীকির সম্মুখে স্বরূপসী সারদা আবির্ভূতা হলেন।

এই দেবী পৌরাণিক সরস্বতী নন, তিনি কবির মানসলক্ষ্মী, সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিহারীলাল বর্ণিতা উষা দেবী আর বাল্মীকির সরস্বতী এখানে এক ও অভিন্না। সারদার দর্শনে কবির আনন্দ, অদর্শনে দুঃখ।

তাকে পেলে তৃপ্তি, না পেলে বিষাদ। জীবনে আনন্দ নেই, মৃত্যুতে নেই শান্তি। সারদাকে যিনি একবার প্রত্যক্ষ করেছেন তার জীবনে আর সুখ নেই। কবি সেই অতৃপ্তি নিয়ে প্রথম সর্গ সমাপ্ত করেছেন।

॥ দ্বিতীয় সর্গ ॥

দ্বিতীয় সর্গে কবির স্বর্গমর্তব্যাপী মানসভ্রমণ—কখনও আনন্দ, কখনও যন্ত্রণা—কখনও শান্তির স্বর্গীয় অনুভূতি, কখনও নরকের দহনজ্বালা। কোন কিছুতেই কবির না আছে সুখ, না আছে স্বস্তি। মানসলক্ষ্মীর অন্বেষণে কবির অপ্রাপ্তির বেদনা—

হারায়েছি হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মানস ভ্রমণের অবসানে কবি আত্মচৈতন্যে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন, 'এ আমি, আমিই রব, দেখুক জগত।'

॥ তৃতীয় সর্গ ॥

তৃতীয় সর্গে কবির হৃদয় দুঃখ-সুখ-আনন্দ বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। সারদার অন্বেষণে কবিহৃদয়ে জেগেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। কবির সারদা কখনো আবির্ভূতা, কখনো তিরোহিতা। কবি কখনো তাকে পান, আবার পেয়ে হারান। প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির অস্থিরতায় কবিহৃদয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তিনি কখনো অনুভব করেন—

তবে কি সকলই ভুল?
নাই কি প্রেমের মূল?
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার?

আবার মুহূর্তের ব্যবধানে মনে হয়—

এ ভুল প্রাণের ভুল
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী;

একবার কবি সারদাকে কল্যাণী উমারূপে প্রত্যক্ষ করেন, আবার হয়—এতো উমা নয়—এযে ভয়ঙ্করী কালী, তিনি সংহারিণী। এই সর্গে সারদা কবির গভীরতর উপলব্ধিতে নিকটবর্তিনী।

॥ চতুর্থ সর্গ ॥

এই তিনটি সর্গ জুড়ে কবির যে অস্থির পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে, চতুর্থ সর্গে তা আর নেই বলে অনুমান হয়। সারদার অন্বেষণে এবার কবি হিমালয়ের পটভূমিতে নিসর্গ সৌন্দর্যকে অবলোকন করছেন। এই সর্গের প্রধান সার্থকতা কবির নিসর্গ-প্রীতির বর্ণনায়। হিমালয়ের ধ্যান

গম্ভীর প্রশান্তি কবির মনেও যেন শান্তি ও সান্ত্বনার সাময়িক প্রলেপ বুলিয়ে দিল। কিন্তু কবির এই মানসভ্রমণ দীর্ঘস্থায়ী নয়। হিমালয়ের বরফগলা জলে গঙ্গার জন্ম। কবিচিত্ত এই গঙ্গার অনুসরণ করেই যেন আবার যন্ত্রণাময় সমতলভূমিতে (মর্ত্যভূমিতে) প্রত্যাবর্তন করেছে।)

॥ পঞ্চম সর্গ ॥

(এই সর্গটিতে দ্বৈত-আকর্ষণের টানা-পোড়েন কবি কখনো অনুভব করেছেন যন্ত্রণার প্রখর রৌদ্রতাপ, কখনো বা সান্ত্বনার শান্তিবারি। একদিকে মর্ত্যভূমির (জন্মভূমির) প্রতি কবির গভীর আকর্ষণ, অন্যদিকে ভাবনালালিত অপরিত্যাজ্য মানসভূমি।)

কবি হিমালয়ের নিসর্গ সৌন্দর্যলোকে আরাধ্যা দেবী সারদাকে একান্ত-ভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

উদার উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়রাণী ত্রিদিব সুষমা!

বিহারীলালের হৃদয়-রাণী আনন্দময়ী মূর্তিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। কবির হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে। আজ কোন বিষাদ নেই, ক্লান্তি নেই, বেদনা নেই।) তাই কবি বলতে পারেন—

আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায়
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!

তবু কবির চোখে জল আসে। এ জল দুঃখের নয়, আনন্দের। শোকের নয়, সান্ত্বনার।

পুনঃ কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণ-কমল আহা ধুয়াই দেবীর!

এখানেই কাব্য সমাপ্ত। "বিহঙ্গম খুলে প্রাণ / ধরেছে পঞ্চম তান / সারদা মঙ্গল গান গাও কুতূহলে!"

তারপর শান্তি গীতি।

সারদামঙ্গল

বিহারীলাল চক্রবর্তী

"সঙ্গমবিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"

—:—

উপহার

গীতি

[রাগিনী ভৈরবী,-তাল আড়াঠেকা]

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সম্মুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার!
কুসুম-কানন মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষন্ন মুখে!
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার!
হয় তো হল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—

প্রথম সর্গ

গীতি

[রাগিনী ললিত,-তাল আড়াঠেকা]

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণকমলে লেখা
আধ আধ রবি রেখা,
সর্বাঙ্গে গোলাপ-আভা সীমন্তে শুকতারা জ্বলে
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি
সদয়া করুণা-মূর্ত্তি,
বিতরেণ হাসি হাসি শান্তি সুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর
ভাঙো ভাঙো ঘুম ঘোর,
সুস্বপ্নরূপিনী উনি, উষারাণী সবে বলে।
বিরল তিমির জাল,
শুভ্র অভ্র লালে লাল,
মগন তারকা-রাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ কিরণাননা
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে
বীনাপানি চন্দ্রাননে,
রাঙা চরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে!

—

১

কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদিকমলে!

মুখখানি ঢল ঢল,
আলু থালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে।

২

কপোলে সুধাংশুভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণা-সিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।

৩

মাথা থুয়ে পয়োধরে
কোলে বীনা খেলা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে।

৪

ভাবভরে মাতোয়ারা,
যেন পাগলিনী পারা,
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগুধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা,
চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিনী !
তুমি সাধকের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে !

৫

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল ;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,

৬

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুন্য তপোবনে
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারী রতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বর তলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল-কানন।

৭

হরিণী মেলিল আঁখি
নিকুঞ্জে কূজিল পাখী,
বহিল সৌরভময় শীতল সমীর,
ভাঙ্গিল মোহের ভুল,
জাগিল মানব কুল,
হেরিয়ে তরুণ-উষা আনন্দে অধীর।

৮

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে ;
নিরখি লোচন লোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে

৯

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

১০

ক্রৌঞ্চ প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।

১১

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মান রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে।

১২

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী- সুরূপসী

যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।

১৩

করে ইন্দ্রধনু বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন ;
কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন !

১৪

হাসি হাসি শশি-মুখী
কতই কতই সুখী !
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু রোষে জ্বলজ্বল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে।

১৫

করুণ ক্রন্দন রোল
উত্ত উত্ত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে ;
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে।

১৬

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আর বার বাল্মীকিরে

নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী ;
কাতরা করুণা ভরে,
গান্ সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

১৭

সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী-ছবি
গদ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

১৮

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল।
হে যোগেন্দ্র যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ছ-নয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও।
কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান্ রতনরাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!
ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান,
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল।

১৯

'এমন করুণা মেয়ে'
আছে যাঁর মুখ চেয়ে,

ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা !
হেরে কন্যা করুণায়
শোকতাপ দূরে যায়,
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা !

২০

এস মা করুণারাণী
ও বিধু বদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার ;
শুনে সে উদার কথা
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার !
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগিজন-তপোবন-স্থলে !

২১

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীলজলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী ।

২২

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে ।

২৩

ফটিকের নিকেতন
দশদিকে দরপন,
বিমল সলিল যেন করে তক্‌তক্ ;
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যে দিকে চায়
সেইদিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া,
নয়নের সঙ্গে সঙ্গে
ঘুরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক ; চক্ষে পড়ে
না পলক।
তেমনি মানস সরে
লাবণ্য-দর্পন-ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া।—

২৪

যেন তাঁরে হেরি হেরি
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা ঘুড়িয়া বেড়ায় ;
চরণকমলতলে
নীলনভনীল জলে
কাঞ্চন-কমল-রাজি ফুটে শোভা পায়।

২৫

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরে না প্রাণে
আনত আননে হাসি জলতলে চান ;
তেমনি রূপসী-মালা
চারিদিকে করে খেলা,
অধরে মৃদু'ল হাসি আনত বয়ান।

রূপের ছটায় ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্মতুলি যুগপত
পরাতে আসেন যবে সীমন্তে তাঁহার

২৭

অমনি স্বপন-প্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়া যায়,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী ;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝরধারা,
চমকে চরণতলে মানস-সরসী।

২৮

কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ-শারদশশী
ইতস্তত শত শত সুর-সীমন্তিনী
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তাঁয়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী।

২৯

কি যে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল !
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী ;
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত-অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে।

তীরে ঘেরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সমস্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে ॥

৩০

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে ।
জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে ॥

৩১

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ;
ভক্তিভাবে একতালে
মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধনমানে নাহি অভিলাষী ।
থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভোরে রাখ,
(তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে ॥)

৩২

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,

তোমা-হারা হলে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই ।
যে কদিন আছে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যেজিব তনু ও রাঙা চরণতলে ॥

৩৩

অদর্শন হলে তুমি,
ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরুলতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বন-ফুল-বনে ।
'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে ॥

৩৪

নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পূরিয়ে যবে
অঘোষিবে সুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্দন
হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায়রে, তখন মনে পড়িবে তোমার !
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ;

করুণা জাগিবে মনে,
ধারা রবে দুনয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায় ;

৩৫

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ;
বেঁধে মারে, কত সয় !
জীবন যন্ত্রনাময়
ছার্‌খার্‌ চূরমার বিনি বজ্রাঘাতে ।
অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারন্য চরাচর,
কুসুম-কানন-মন বিজন শ্মশান ;
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি কমল-বাসিনী কোথারে আমার ;
কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্নিমা—চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধা মাখা সহাস বয়ান !
কোথা গেলে সঞ্জীবনী !
মণি—হারা মহাখনি
অহো, সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার !
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও,
অয়ি, সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে !

———

দ্বিতীয় সর্গ

গীতি

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ]

হারায়েছি—হারিয়েছিরে, সাধের স্বপনের ললনা!
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বল না!
কমল-কাননে বালা,
করে কত ফুলখেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না!
প্রিয় ফুলতরুগণ,
সুধাকর, সমীরণ,
বল বল ফিরে কি আর পাব না!
কেন এল চেতনা!

১

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমনতর
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর!
উদার ললাট ঘটা,
লোচনে বিজলীছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর

২

সৌম্যমূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-ভরা,
পিঙ্গল বল্কল পরা,
নীরদ-তরঙ্গ-লীলা জটা মনোহর;
শুভ্র অভ্র উপবীত
উরস্থলে বিলম্বিত,

৩

কুসুমিতা লতা ভালে,
শ্মশ্রুরেখা শোভে গালে,
করেতে অপূর্ব্ব এক কুসুম রতন ;
চাহিয়ে ভুবন পানে
কি যেন উদয় প্রাণে,
অধরে ধরে না হাসি—শশীর কিরণ ।

৪

কি এক বিভ্রম ঘটা
কি এক বদনছটা,
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-লহরী
মন্দাকিনী আসি কাছে
থমকে দাঁড়ায়ে আছে,
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে অমর প্রহরী ।

৫

নধর মন্দাররাজি
নবীন পল্লবে সাজি
দূরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়া দাঁড়ায় ।
গরজি গম্ভীর স্বরে
জলধর শির'পরে
করি করি জয়ধ্বনি চলে দুলে দুলে ।
তড়িত ললিতবালা,
করে লুকাচুরি খেলা,
সহসা সমুখে দেখে চমকে পালায় ।
অপ্সরী বাঁশরী করে
আনন্দে শিখরী পরে
আনন্দে বিজয় গান গায় প্রাণ খুলে ।

৬

দিগঙ্গনা কুতূহলে

বরষে মন্দার-ধারা আবরি গগন।
আমোদে আমোদময়,
অমৃত উথুলে বয়,
ত্রিদশ-আলয় আজি আনন্দে মগন।
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তঋষি
প্রভায় উজলি দিশি,
সম্ভ্রমে কুসুমাঞ্জলি অর্পিছেন পদতলে।

৭

সে মহাপুরুষ-মেলা,
সে নন্দনবন-খেলা,
সে চিরবসন্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই ;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার !

৮

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে !

৯

কেন গো ধরণী রাণী
বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় তরুলতা
ডেকে নাহি কয় কথা,

১০

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোল গো অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল কোন পদ্মবনে
লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

১১

অয়ি, একি, কেন, কেন,
বিষণ্ন হইলে হেন !
আনত আনন-শশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থরথর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে না বচন।

১২

তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন !
বল বল চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন !

১৩

বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা কটাক্ষ দানে
চাবে না আমার পানে, কবে নাও কথা ;
কেন যে কবে না হায়
হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাঁধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা !

১৪

যদি মর্ম্মব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয়।
দেববালা ছলাকলা জানে না কখন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন।

১৫

অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি
স্বরগ-কুসুম-মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্ল মুখে মস্তকে সকলি।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী !

১৬

নরকে নারকি-দলে
মিশিগে মনের বলে,
পরান কাতর হলে ডাকিব তোমায় ;
যেন দেবী সেই ক্ষণে
অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেল না চরণে, দেখো, ভুল না আমায়।

১৭

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী ;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল ;
কভু মরীচিকা মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ ! কি বিষম বাজে যেই ভাঙে ভুল !
এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

১৮

যেমন আকৃতি আহা,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরাণ,
সে কি গো এমন হবে,
মোর ছুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর ফিরাবে বয়ান !

১৯

ভাবিতে পারিনে আর !
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘুর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর ;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মুখে চোকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে ; ধর ধর ধর ;—

২০

ধর, আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছি ছি একি কর কর,
মর যদি মরা চাই মানুষের মত ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক জগত।

২১

মহান মনেরি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদেরাই পতঙ্গের প্রায় ;
জ্বলুক যতই জ্বলে
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ;
হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;
অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি !

২২

হা ধিক্ অধীর হেন !
দেখেও দেখ না কেন
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণ-প্রতিমায় !
প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করো না মনে,
সাগর দোলায় দোলা শিশুরি মানায়।

সারদা সরলা বালা,
সবে না সন্দেহ জ্বালা
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয়কমলে ॥

তৃতীয় সর্গ

গীতি

[রাগিণী-বিভাস—তাল আড়াঠেকা]

বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমলবনে !
আজো ফিরে অভাগিণী ভালবাস মনে মনে !
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকন কেশ,
মলিন মধুর-মূর্ত্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে !
মলিন কমল-মালা,
মলিন মৃণাল বালা,
আর সে অমৃত-জ্যোতি জ্বলে নাক বিলোচনে
চির আদরিণী বীণা
কেন, যেন দীনহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে অচেতনে !
জীবন-কিরণ-রেখা,
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি কমল দেবী ফুটিবে না আর !
যাও বীণা লয়ে করে
ব্রহ্মার মানস সরে,
রাজহংস কেলি করে স্বর্ণ-নলিনী সনে।

১

আজি এ বিষণ্ণ বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে দেবী জন্মের মতন !
পূর্ণিমা প্রমোদ আলো,
নয়নে লেগেছে ভাল ;
মাঝেতে উথলে নদী, দুপারে দুজন—
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন !

২

নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয়-বীণার মাজে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন ।

৩

সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম সেই স্নেহ
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মন্দাকিনী তীরে দুপারে দুজন !

৪

আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
মিলিবারে ধাবমান ;
কেন এসে অভিমান সম্মুখে উদয় !
কান্তি শান্তিময় তনু,
অপরূপ ইন্দ্রধনু,
তেজে যেন জ্বলে মন, অটল হৃদয়,

কাতর পরাণ পরে
চেয়ে আছে স্নেহভরে,
নয়ণ কিরণ যেন পীযুষ-লহরী ;
এমন পদার্থে হেলি
যাব না যাব না ঠেলি,
উভয় সঙ্কটে আজ মরি যদি, মরি

৬

কেন গো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর।
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেণ ভোলা খেপা দিগম্বর।

৭

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশ শ্মশান ;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

৮

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করি রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমিররাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার

৯

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে !
কি বিচিত্র সুর তান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাইছ গান আকাশ মণ্ডলে !
কি বিচিত্র সুর তান
ভরপুর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে !

১০

জ্যোতির প্রবাহ মাজে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে !
কে তুমি লাবন্যলতা মূর্ত্তি মধুরিমা,
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা !

১১

ফুটে ফুটে অবিরল
হাসে সব শতদল,
অবিরল গুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায় ;
সমীর সুরভিময়
সুখে ধীরে ধীরে বয়,
লুটায়ে চরণতলে স্তুতিগান গায়।

১২

আচম্বিতে একি খেলা !
নিবিড় নীরদমালা !
হাহা রে, লাবণ্য-বালা লুকাল, লুকা'ল।

এমন ঘুমের ঘোরে
জাগালে কে জোর কোরে,
সাধের স্বপন আহা ফুরা'ল, ফুরা'ল !

১৩

বসন্তের বনমালা
ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন-সুন্দরী !
মনের মুকুরতলে
পশিয়ে ছায়ার ছলে
কর কত লীলাখেলা ; কতই লহরী !

১৪

কোথা থেকে এস তারা,
মাখিয়ে সুধার ধারা,
জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশান্ত সময়ে !
(লয়ে পশুপক্ষী প্রাণী
ঘুমায় ধরণী রাণী,)
কোথায় চলিয়ে যাও অরুণ উদয়ে !

১৫

ফের একি আলো এল !
কই কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার !
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপার মত,
জীবন-কুসুম—লতা কোথারে আমার !

১৬

কোথা সে প্রাণের পাখী,
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকে না আমায় !

বল দেবী মন্দাকিনী !
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোনামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায় !

১৭

এই না, তোমারি তীরে
দেখা আমি পেনু ফিরে,
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে।
কি বিচিত্র সুর তান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে !
হা ধিক্ রে অভিমান
গেল গেল গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে

১৮

হারায়ে নয়ন-তারা
হয়েছি জগত-হারা,
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই ;
ওহে ভাই দাও বোলে
কোন দিকে যাব চোলে,
ওকি ওঠে জ্বোলে জ্বোলে, কোথায় পালাই !

১৯

ওকি ও, দারুণ শব্দ,
আকাশ পাতাল স্তব্ধ ;
দারুণ আগুন হুহু ধুধু ধুধু ধায়,
তুমুল তরঙ্গ ঘোর,
কি ঘোর ঝড়ের জোর,
পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায় ?

তবে কি সকলি ভুল !
নাই কি প্রেমের মূল !
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ?

২১

শত শত নরনারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরো হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায় ;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !

২২

ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধা পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

২৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেতশিলাসনে
খোলা প্রাণে রতিকাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি ;
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।

২৪

পারিজাত-মালা করে,
চাহি চাহি স্নেহভরে
আদরে পরসপরে গলায় পরায় ;
মেজাজ গিয়েছে খুলে,
বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায় ।

২৫

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল গল মন ।

২৬

করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর ;
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর কমলদল কাঁপে থরথর ।

২৭

প্রনয়-পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ ধাম !
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ !
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি ;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলু থালু কেশ !

২৮

বিহ্বল পাগল প্রানে
চেয়ে সতী পতি পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দীবর ফুটি,
ঢুলু ঢুলু ঢুলু ঢুলু করিছে কেমন !

২৯

আলসে উঠিছে হাই
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপনমত চলিয়াছে মনে ;
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রানখোলা হাসি !
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে !

৩০

উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুইজন ;
সুরে সুরে সম্ রাখি
ডেকে ডেকে উঠে পাখী,
তালে তালে ঢলে ঢলে চলে সমীরণ।

৩১

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রনয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর ;
সাজিয়ে মুকুল ফুলে
অহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জলতা নাচে মনোহর।

সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিয়ে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কৌতুহলে ॥

৩২

এ ভুল প্রানের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী ।

৩৩

কভু বরাভয় করে,
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ;
কখন গেরুয়া পরা,
ভীষণ ত্রিশূল ধরা,
পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর ;
দীপ্ত সূর্য্য হুতাশন
ধ্বক ধ্বক ত্রিনয়ন,
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির ;
ঘোর ঘট্ট অট্টহাসি
ঝলকে পাবক রাশি;
প্রলয় সাগরে যেন উঠেছে তুফান ।

৩৪

কভু আলু থালু কেশে
শ্মশানের প্রান্ত দেশে

গঙ্গার তরঙ্গমালা
সম্মুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে।

৩৫

পবন আকুল হয়ে
চিতা-ভস্মরজ লয়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায়,
শ্বেত করবীর বেলা,
চামেলি মালতী মেলা,
ছড়াইয়ে চারিদিকে কাঁদিয়ে বেড়ায়।

৩৬

হায় ফের বিষাদিনী
কে সাজালে উদাসিনী
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী সম্বর সম্বর !
বটে এ শ্মশান মাঝে
এলোকেশী কালী সাজে
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর !

৩৭

আবার নয়ন জল !
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজরা জীবন আমার ;
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়ায় ত্রিশূল ধোরে
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার।

৩৮

আমার এ বজ্রবুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্মমুখ,
দাও দাও বসাইয়ে এড়াই যন্ত্রনা !

সম্মুখে আরক্ত মুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয় ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা।

৩৯

অনন্ত নিদ্রার কোলে
অনন্ত মোহের কোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন,
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদিব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন!

৪০

তপন তর্পণ-আল
অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞ্ঝা, নীরব মেদিনী।

৪১

বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয়;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল;
সহে যার চিরকাল;
বাঁচুক্ বাঁচুক্ তারা হউক্ অমর!

৪২

হবে না হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না বৃথা রুধ না আমাকে!

এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ পাখী,
দেখুক দেখুক যদি আর কিছু থাকে !
ছাড় ! আন ! যাও যাও !
বেগে বুকে বিঁধে দাও !
ওই সে ত্রিশূল দোলে গগনমণ্ডলে !

চতুর্থ সর্গ

গীতি

[রাগিণী ভৈরবী,—তাল ঠাং-ঠুংরি]

কোথা গো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার !
যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার।
সেই সুরধুনী-কূলে
ফুলময় ফুলেফুলে,
বেড়াইতে বনবালা পরি ফুলহার।
নবীন-নীরদ-কোলে
সোণার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক ঝুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার।
সুধাংশু মণ্ডলে বসি
খেলিতে লইয়ে শশী,
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন ;
হাসি দিগঙ্গনা গণে
ধরি ধরি সে রতনে
খেলিত কন্দুক খেলা, হাসিত সংসার ;
এ তমোন্ধ তলাতলে
কি বিষম জ্বালা জ্বলে,
কেবল জ্বলিয়ে মরি ঘোচে না আঁধার ;
চল দেবী লয়ে চল,
যথা জাগে হিমাচল,
উদার সে রূপরাশি দেখি একবার !

১

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

২

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

৩

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে !

৪

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হর হর হর হর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না শ্রবণে

৫

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে

জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে ।

৬

কালের করাল হাসি
দলকে দামিনী রাশি
কক্কড়্ দন্তে, দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগৎ ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !

৭

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ রাশি
ঝুবন্ তপন করে ঝক্‌ঝক্ করে !
উপরে বিচিত্র রেখা,
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে ॥

৮

ওই কিবে ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর !
দাঁড়াইয়ে পাদদেশে
ললিত হরিতবেশে
নধর-নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরথর ।

৯

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে

বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন !

১০

ওই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক–ঘটা ছটা রক্তময় !
তৃণ তরু লতাজাল,
অপরূপ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়।

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচু-মুখে উচকানে
চড়িয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিকন শুভ্র কায়,
নাচি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী

১২

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার !
দূর দূর আলবালে
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার ।

১৩

তলে তৃণ লতা পাতা ;
সবুজ বিছানা পাতা ;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায় ।
কেমন পাকম ধরি,
কেকা রব করি করি,
ময়ুর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় !

১৪

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ;
কত রকমের পাখী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহ্লাদে আকুল ।

১৫

জলধারা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারিদিকে ;—
চমকি আকাশ-ময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে ।

একি স্থান অভিনব !
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায়
গায়ে তরু লতা পাতা
থোলো থোলো ফুল গাঁথা,

বরফের—হীরকের টোপর মাথায়।

১৭

তলভূমি সমুদয়
ফুলে ফুলে ফুলময়,
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ;
আকাশ পড়েছে ঢাকা
আর নাহি যায় দেখা
তপনের সুবর্ণের তরল নিশান,

১৮

কেবল বিজলী মালা
বেড়ায় করিয়ে খেলা ;
কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর !
তোমরা কি সারদারে
দেখেছ এনেছ তারে
ভূষিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর !

হায় দেবী, কোথায় তুমি !
শূন্য গিরি-ফুলভূমি !
কোথায়—কোথায়—হায়—সারদা—সারদা !—
আর কেন হাস্য-মুখে !
হান উগ্র বজ্র বুকে !—
কি ঘোর তামসী নিশি !—* * * *

২০

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ !
বুঝিলে তুমি বেদন !
বুঝিল না সুলোচনা সারদা আমার !—
হা মানিনী ! মানভরে
গেছ কোন্ লোকান্তরে !—

বল দেব, বল বল কুশল তাহার !

২১

অয়ি, ফুলময়ী সতী
গিরি-ভূমি ভাগ্যবতী !
অভাগার তরে তব হয়নি সৃজন
দেখা যদি পাই তার,
দেখা হবে পুনর্ব্বার ;
হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন ॥

২২

ওই ওই ভৃগুভূমে,
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
রয়েছে আকাশে মিশে অপরূপ স্থান !
আব্‌ছা আব্‌ছা দেখা যায়
গুহা গোমুখের প্রায়,
পাতায় ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান।

২৩

ফেনিল সলিল রাশি
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে ;
সুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে !—
অসংখ্য শীকর শিলা ছোটে চারি ভিতে।

২৪

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,

ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরসি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার !

১৫

আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন !
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুলবুলে ফণী অগণন !

১৬

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
এক বেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝর ঝর কল কল
ঘোর রাবে ভাঙে জল,
পশু-পক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায় !

১৭

সিংহ দুটি শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে ;
আলসে তুলিছে হাই,
কাকেও দৃক্‌পাত নাই,
গ্রীবা ভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদী পানে

১৮

কিবে ভৃগু-পাদমূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ঢ'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী !

কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত-পাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা!
জুড়াও ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে!

পঞ্চম সর্গ

গীতি

[রাগিণী বেহাগ.—তাল কাওয়ালী]

মধুর রজনী,
মধুর ধরণী,
মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর!
ভাগীরথী-বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীরে ধীরে!
আলুথালু কেশ,
আলুথালু বেশ,
সমায় কামিনী রূপসী রুচির!
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ,
অধর পল্লব অলূপ অধীর
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মূরতি মদির!

———

১

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর !
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব—গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে
ঘুঘু ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।

২

তৃষায় ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতি পাতি
বেড়ায় মহিষ যূথ চারিদিকে ফিরে।
এলায়ে পড়িছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে।

৩

কিবে স্নিগ্ধ দরশন
তরুরাশি ঘন ঘন,
অতল পাতালপুরী নিবিড় গহন !
যতদূর যায় দেখা
ঢেকে আছে উপত্যকা,
গম্ভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন।

কায়াহীন মহাছায়া
বিশ্ববিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী রূপিনী,
অসীম কানন তল
ব্যেপে আছে অবিরল ;
উপরে উজলে ভানু ভূতলে যামিনী।

৫

ঘোর্ ঘোর্ সমুদয়,
কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ;
অনন্ত বরষাকালে
অনন্ত জলদজালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জলন্ত তপন।

৬

পত্র-রন্ধ্র ধরি ধরি
কিরণের ঝারা ঝরি
মানিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিকন শাদ্বল দলে
দীপ্ দীপ্ কোরে জ্বলে
তারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে॥

৭

নভ-চুম্বী শৃঙ্গবরে
ওকি দপ দপ করে।
কুঞ্জে কুঞ্জে দাবানল হইল আকুল ;
তরু থেকে তরু পরে,
বন হতে বনান্তরে
ছুটে যেন ফুটে ওঠে শিমুলের ফুল।

৮

অর্চ্চি পুঞ্জ লক লক,
ভক্ ভক্, ধ্বক্ ধ্বক্,
দাউ দাউ, ধুধু ধুধু ধায় দশ দিকে ;
ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝা হঞ্ঝা ছোটে
বোঁবোঁ বোঁবোঁ চক্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে।

৯

দেখিতে দেখিতে দেখ
কেবল অনল এক,
একমাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ;
আগ্নেয় শিখর 'পরে
যেন ওঠে বেগ ভরে
ভীষণ গগনমুখী আগুনের নদী।

১০

দিগঙ্গনাগণ যেন
আতঙ্কে আড়ষ্ট হেন,
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ;
চতুর্দ্দিকে লম্ফে ঝম্পে
মত্ত যেন রণদম্ভে
তোলপাড়্ কোরে ধায় দারুণ বাতাস-
উঃ কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস।

১১

ত্রিলোকতারিণী গঙ্গে,
তরল তরঙ্গ রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি,
চলেছে মা মহোল্লাসে !
তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী।

১২

আহা স্নেহ-মাখা নাম,
আনন্দ—আনন্দ ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি তুমি কোথায় এখন !

এ বিজন গিরিদেশে
প্রকৃত প্রশান্ত বেশে
যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে ওঠে মন ;—
কেন মা ! আমার তত কেঁদে ওঠে মন !

১৩

হে সারদে দাও দেখা !
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয় :
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কানে,
বেদনা দিও না প্রাণে ব্যথার সময় !

১৪

অহ, অহ, ওহো, ওহো,
কি মহান্ সমারোহ !
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার !
নিসর্গ মহান-মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
চতুর্দ্দিকে যেন মহাসমুদ্র অপার ।

১৫

অনন্ত তরঙ্গমালা
করিতে করিতে খেলা
কোথায় চলিয়া গেছে, চলে না নজর ;
দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে
মায়ায় মিশিয়া জাগে
উদার পরার্থরাজি সাজি থরে থর ।

১৬

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর পর

এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব সুষমা !
এ নিসর্গ রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা !

১৭

আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কান নাই মন নাই আমার কথায় ;
মুখখানি হাসহাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশ পাশ বাতাসে লুটায়।

১৮

না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজিকে বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী ;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে !

১৯

আহা কি ফুটিল হাসি
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসি মুখখানি প্রেয়সী তোমার,
বিষাদের আচরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার !
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,

আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার !

২০

ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে জনার নেশার শয়নে ;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়, বেড়ায় কি ঝোকে ঝোকে
আপনার মনে,
এস বোন, এস ভাই
হেসে খেলে চলে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ-কাননে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

২১

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
হে প্রশান্ত গিরিভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

২২

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার !
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার।

২৩

আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে দেখিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।

১৪

দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!

১৫

এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়ামায়া নাই মনে কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপানে কাটিবে কেরে সেই ফুলডোর!

১৬

পুন কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানস সরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর!

বিহঙ্গম ! খুলে প্রাণ
ধররে পঞ্চম তান !
সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতূহলে !

॥ ইতি ॥

শান্তি

গীতি

[রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ঠুংরি]

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার !
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার !
সদা যেন ঘরে ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার !
ধাইয়ে হরষ-ভরে
কলকোলাহল করে,
হেসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার !
হয়ে কত জ্বালাতন
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার !
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছে ঢলঢল সম্মুখে আমার !
ক্ষুধা তৃষা দূরে রাখি,
ভোর হ'য়ে বসে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার !
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসী তার !

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কবি বিহারীলাল ও তাঁর সারদামঙ্গল

১

বাঙলা গীতিকবিতার ধারায় বিহারীলাল স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত একটি স্মরণীয় নাম।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্যের কৃত্রিম ক্লাসিক (Pseudo-Classic) ধারার পর রোম্যান্টিক গীতি-কাব্যের প্রবর্তন কৃতিত্বে এবং বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজস্থানীয় গুরুরূপে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। কবিশেখর কালিদাস রায়ের মতে "উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যালোকে বিহারীলাল একেবারে দলছাড়া, Like a star that dwelt apart. স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উন্নতশীর্ষ কবি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।" রবীন্দ্রনাথ গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর আবির্ভাবের সুন্দর চিত্র-অঙ্কন করেছেন, "সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।......সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

ইংরেজ কবি wordsworth-এর মতো বিহারীলালও ক্লাসিক-যুগের অবসান ঘটিয়ে রোমান্টিক-যুগের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। Lyrical Ballads প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী কাব্যে ক্লাসিক যুগের অবসান হলো। কিন্তু ইংলণ্ডে রোম্যান্টিক কাব্যের আবির্ভাব আকস্মিক নহে, এর একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি-পর্ব ছিল। ১৭৪০ থেকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি এই ছাপান্ন বৎসরকে Lyrical Ballads এর প্রস্তুতি-পর্ব বলা যায়। Wordsworth, Coleridge, Shelley প্রভৃতি কবিগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডে Romantic-Revival যুগের সূচনা হলেও তাঁদের পূর্বসুরী হিসেবে cowper, crab প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। বিহারীলালের আবির্ভাবের ক্ষেত্রেও তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতির পূর্ব রচনাকে স্মরণ করতে হয়।

কিন্তু এই মিল নিতান্ত আকস্মিক এবং বহিরঙ্গীয়, কাল ও যুগ-মানসের বিচারে wordsworth-এর সঙ্গে বিহারীলালের বিস্তর পার্থক্য আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ব্যবধান আছে, বিশেষ যুগে আবির্ভূত কবিগোষ্ঠী বিশেষ ভাবনা-চিন্তায় ও কাব্যাদর্শে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা নির্দ্দিষ্ট স্বরের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য হন। সেই আদর্শ-সাম্যে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের কবিগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র-যুগ কল্পনা করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাঙলা কাব্য-প্রবাহের বিশ্লেষণে অনুরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। ইংলণ্ডে ক্লাসিক-কাব্যধারার সূত্রপাতে প্রাক্তন রোম্যান্টিক গীতিকাব্যের গতিপথ রুদ্ধ ও উৎসভূমি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। বাঙলাকাব্যের ক্ষেত্রে এমন সর্বনাশা কাল কখনও আসেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলা কাব্যে বীররসের প্রচুর আমদানী হলেও একে যথার্থ ক্লাসিক-যুগ আখ্যা দেওয়া যায় না। এই সময়ে বাঙালির জাতীয় চরিত্রের গঠনে এক উদ্দীপনাময় সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলেছিল, এবং নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ বাঙালি-মানসিকতায় এক জড়তা বিরোধী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। ক্লাসিক-ধর্মী কাব্যসমূহে সেই সাময়িক উত্তেজনার সুর সুস্পষ্ট হলেও এই কাল-সীমাতেই সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি খ্যাতিমান লিরিক-কবিগণ তাঁদের কাব্যরচনা করেছেন। এমন কি তথাকথিত বীরযুগের রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিগোষ্ঠী form ও spirit-এর দিক থেকে একই আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেননি। আসলে, বাঙলাকাব্যের মূলধারাটি বীররসের কঠোর পথে অগ্রসর হয়নি বেশীদিন, মাটি-ঘেষা মানুষের সহজ-নিঃশ্বাসেই তাতে কুলু কুলুধ্বনি জেগেছে। বিহারীলালকে বুঝতে হলে এই ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাঙলা কাব্যের প্রত্যুষ-লগ্নেই গীতি-কবিতার সোনালী-আশ্বাস দেখা গিয়েছিল চর্যাপদের মধ্যে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-কবিগণ রাধাকৃষ্ণের নামের অন্তরালে প্রাকৃত নর-নারীর প্রেমাকৃতিকে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের দিকে প্রেরণ করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রেমের যে strangeness এবং beauty ফুটে উঠেছে, তা রাধা-কৃষ্ণের নাম-সংস্পৃক্ত না হলেও কোনদিন মলিন

হতো না। তবে কাব্য-বিচারের আধুনিক মানদণ্ড সেখানে সুপ্রযুক্ত নয়। মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী মূলতঃ সঙ্গীতের জন্য রচিত, শ্রোতারাই ছিলেন এই ধর্মসম্পৃক্ত স্বগতঃ সঙ্গীতের প্রধানতম বিচারক। প্রাচীন গ্রীসেও অনুরূপ উদ্দেশ্যে Lyric-কাব্য রচনার সূত্রপাত হয়।)

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, প্রাক-আধুনিক কোন কাব্যই ব্যক্তি-মনের জিজ্ঞাসায় মুখর হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যযুগে বিশুদ্ধ সারস্বত প্রেরণায় কোন কবিই কাব্যরচনা করতে পারতেন না। সমকালীন সমাজ-মানস সেরূপ কোন আনন্দ-রস পান করবার অনুকূল পরিবেশের মধ্যে লালিতও হয়নি। অবশ্য এই যুগের লোকসঙ্গীতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমের ব্যাকুলতার সুরটি একেবারে অশ্রুত ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের মূলধারাটি লোকসঙ্গীতের সঙ্গে অনিবার্যসূত্রে জড়িত ছিল না। পল্লী-বাঙলার নিরক্ষর মানুষের অন্তপুরেই এর বাস। বৈষ্ণব-পদাবলী ও শাক্তপদাবলীর প্রধান স্রোতোধারায় বাঙলার কাব্যপ্রবাহ আধুনিককালের সীমান্তে এসে পথ-বদল করেছে।

এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ভারতচন্দ্রের রচনায় ও কবিগানের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্বেই বলেছি, আদি ও মধ্যযুগের বাঙলা গীতি-কাব্য ছিল দেবকেন্দ্রিক। আধুনিককালের কাব্যেও দেবতার স্থান আছে। তবে আধুনিক-সাহিত্যে দেবতা গৌন, মানুষই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিহারীলালের সারদামঙ্গলও দেবতাবর্জিত রচনা নয়। কাব্যের নামকরণেও দৈব-স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। তবু, নামসাদৃশ্য বাদ দিলে রূপ-কর্মের দিক থেকে এই কাব্যটি প্রাচীনধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতের রচনা। বৈষ্ণবকাব্যের বহির্মুখী ভাবপ্রবাহের অন্তস্থলে মানবপ্রেমের অস্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করা গেলেও আধুনিক গীতিকাব্যের কোন বৈশিষ্ট্যই এতে লক্ষ্য করা যায় না। আধুনিক রোমান্টিক গীতিকাব্যে ব্যক্তির কথাই প্রধান, দেবতা প্রাসঙ্গিক বিষয়মাত্র। বৈষ্ণবকাব্যের মত আধুনিক গীতি-কাব্যে সঙ্গীতধর্ম থাকলেও কাব্যরূপেই অধিক প্রচারিত। তবে পদাবলীর সঙ্গে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রধান পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গিগত। মধ্যযুগীয় পদাবলীসমূহে আত্মভাবহীন ব্যক্তিনিরপেক্ষ আবেদনই প্রধান, কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্য অহংবোধের (Ego) কোমল রসে জাড়িত।

বিহারীলাল যে-কালে আবির্ভূত সে-কালে মানুষ তার প্রাক্তন

সমাজাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তি-জিজ্ঞাসার দ্বারা মুহুর্মুহু আন্দোলিত হতে সুরু করেছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানুষ তখন একটুখানি ছোট্ট সুখ আর ছোট্ট আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত, চঞ্চল। সারদা-মঙ্গলে বিহারীলালও নিরন্তর শান্তির সন্ধানেই কাব্য-পরিক্রমা করে বেড়িয়েছেন। কাজেই প্রাক-বিহারীলাল পর্বে বাঙলা কাব্যজগতে বীর-রসের যে প্রাদুর্ভাব হয়েছিল—তা নিতান্তই আকস্মিক এবং অচিরস্থায়ী। একথা অবশ্য স্বীকৃত, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা বীররসাত্মক কাব্যের (Heroic Tale) সূত্রপাত ইংরাজী ক্লাসিক-কাব্যের সঙ্গে সমকালীন বাঙালি কবিগণের পরিচয়সূত্র থেকেই হয়েছিল। কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ধারাটি বিশেষ দূর অগ্রসর হতে পারলো না বলেই গীতিকাব্যের মোহময় সঙ্গীতে তা চির-নিদ্রিত হলো। মেঘনাদ বধের কবিও বাঙলা কাব্যের এই প্রবনতাটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

যাই হোক, আধুনিক বাঙলা গীতিকাব্যধারার মৌল-প্রবনতাটুকু বিহারীলালের কাব্যেই প্রথম সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। যাকে awakening of the self বা আত্মভাবের উদ্বোধন বলা হয়, বিহারীলালের কাব্যে সেই সুস্পষ্ট যুগ-নির্দেশক বৈশিষ্টটি লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজ কবি Blake-এর কথা মনে পড়ে। Blake তাঁর কাব্যে প্রকৃতির বর্ণ ও শ্যামল-সজীবতাকে সঙ্গীতরূপে অনুভব করেন—"I feel a green tree into my ears." বিহারীলালের কাব্যেও এই abstraction আছে—"শুধু দেখি, শুধু গান গাই।" বাস্তব-জগতের শত কোলাহলের মধ্যেও বিহারীলাল একান্ত নিঃসঙ্গ, অপ্রাপ্তি এবং সংশয়ের দোলায় সদা মুহ্যমান। Blake-ও অনুরূপভাবে অপরিচিত সমুদ্রের নিঃসঙ্গ নাবিক—"Voyaging in the strange seas of thought alone." বাঙলাকাব্যে বিহারীলালের পূর্বে আত্মমুখী-চেতনার এমন ঘনিষ্ঠ-চিত্র আর কোন কবি অঙ্কন করেননি।

বিহারীলালের কাব্য ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যের তূর্যনিনাদের মধ্যে এক শান্ত-সমাহিত কোমল সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনায় বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে সুর করুণ, ঝর্ণাধারার মতো উচ্ছল, সজীব ও রসসিক্ত। ক্লাসিক-যুগ পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে তারই প্রতিক্রিয়ায় রোম্যান্টিক কাব্যের সূত্রপাত।

২

বিহারীলাল রোম্যান্টিক কবি, তাঁর পরিণতি mysticism-এ। বিশ্ব-রহস্যকে অনুসন্ধান করার ব্যাকুলতা শিল্পীমাত্রেরই লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। প্রতিদিনের তুচ্ছতা ও ধূলি-মালিন্যের মধ্যে কল্পিত আদর্শলোকের অনুপস্থিতিতে কবি-চিত্তে বেদনা ও বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। রোম্যান্টিক মানস অপ্রাপ্তির বেদনায় সদা চঞ্চল। বিহারীলালের রোম্যান্টিক-চেতনা বেদনা-ব্যাকুলতার রূপায়ণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও ইঙ্গিতের মধ্যে অবসিত হয়েছে। সুর আর ছবি কখনো সমভাবে বিহারীলালের কাব্যে মিলতে পারেনি। রোম্যান্টিক বেদনা থেকে বারবার তিনি মিষ্টিক আনন্দের মধ্যে আত্মহারা হয়েছেন, চোখে দেখা ছবি এমনিভাবে বারবার সুরের ঝঙ্কারে ডুবে গেছে। কিন্তু মিষ্টিক আনন্দের আলোকরাজ্যে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো মনও তাঁর ছিল না, পুনরায় মর্তচারী হয়ে উঠেছে কবি-মন—হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তাঁর মিষ্টিক-আনন্দ রোম্যান্টিসিজমের সংশয়ে বিপর্যস্ত হয়েছে।

সারদা-পরিকল্পনায় তাঁর রোম্যান্টিক ও মিষ্টিক-মানসের সক্রিয় সহাবস্থান লক্ষণীয়। তাঁর সারদা কখনো সীমাহীন সুদূরের বার্তাবাহী আবার কখনো সীমাবদ্ধ মর্তলোকবাসিনী। বস্তুতঃ বিহারীলালের সারদা Realism, Idealism ও mysticism-এর সমন্বিতরূপ। কোন একটি বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্থির থাকবার মত সংযম বা মানসিকতা তাঁর কোনদিনই ছিল না। অন্বেষণে বিহারীলাল রোম্যান্টিক—তিনি প্রতিনিয়ত "কান্তি সংকলিত কায়া অপরূপা ললনাকে" অনুসন্ধান করে ফিরেছেন; আবার সাধক হিসেবে তিনি মিষ্টিক—বিশ্বময়ী কান্তি দীপ্তি অনুপমাকে সর্বভূতে—আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। রোম্যান্টিক ও মিষ্টিকমনের দ্বন্দ্বে কবি-মন কখনো তৃপ্ত হয়নি—আকাশচারী বিহঙ্গের মতো গভীর মমতা ও তৃষ্ণা নিয়ে তিনি অ-পূর্ণ মর্ত্যকে ফিরে পেতে চেয়েছেন। ঘর তাঁকে শান্তি দিলো না, বাহির দিলো না তৃপ্তি। ঘর ও বাহিরের প্রতি কবির এই দ্বান্দ্বিক আকর্ষণই সারদামঙ্গলের যথার্থ ভিত্তিভূমি। বস্তুতঃ অসীম রূপকল্পনা বা অতীন্দ্রিয় অখণ্ডবোধ এর কোনটিই বিহারীলালকে সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারেনি।

সারদামঙ্গলের সূত্রপাতে আমরা কবির রোম্যান্টিক অভিসারের

স-সংশয় বিচরণ লক্ষ্য করি, কিন্তু কাব্যসমাপ্তিতে কবি মিষ্টিক আত্ম-পরিক্রমায় নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। পৃথিবীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ-রোমান্টিক কবিই শেষ পর্যন্ত মিষ্টিসিজমের প্রশান্তিতে আত্মলীন হতে চেয়েছেন। বিহারীলালের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না।

কবি কাব্যারম্ভে সারদার যে স্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন, তাতে সারদা তাঁর "মানস-মরালী", "আনন্দরূপিনী";—তাঁর আবির্ভাবে "চমকে গগনে তারা, ভূধরে নির্ঝর ধারা, চমকে চরণতলে মানস-সরসী।" কিন্তু কবির এই বিস্ময় ও আনন্দ নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, তাই সারদা কবির নিকট বারবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মানুষের জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের প্রতি, প্রাত্যহিক জীবনের বৈচিত্র ও তুচ্ছতার প্রতি, বিশ্বপ্রকৃতির খণ্ডসৌন্দর্যের প্রতি যাঁর এত মমতা—তাঁর পক্ষে নির্দ্বন্দ্ব আনন্দের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। ফলে, সারদা কখনো অস্পষ্ট আভাসে, কখনো ভয়ঙ্করী সৌন্দর্যরূপিনী হয়ে কবির নিকট ধরা দিয়েছেন। কখনো তিনি তাঁকে সঙ্গীতরূপে হৃদয়ে অনুভব করেন, আবার পরমুহূর্তে কেতকীকুঞ্জে, চম্পকপুঞ্জে সাধের রূপে লক্ষ্য করেন।

ক্রমেই কবির নিকট সারদা কায়াবদল করতে থাকে। সারদাকে ভাবতে গিয়ে কবির মৃতা মায়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন নন্দনবনের স্নেহপ্রেমে অতৃপ্ত সাধকের গৃহের টানে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন। চিরবসন্ত এই কবি প্রার্থনা করেন না, শীতের পাতা-ঝরা দিনের অবসানে মুকুলিত বসন্তকে উপভোগ করতে চান। তাই অমরাবতীর দ্বারে যোগেন্দ্রবালার সান্নিধ্য-কামনা; সৌন্দর্যরূপিনী ঊষার সঙ্গে মর্তনারীর স্মৃতি ও সতীত্ব অনায়াসে মিশে যায়। প্রকৃতপক্ষে, বিহারীলালের সারদা রোমান্টিক ও মিষ্টিক চেতনার যুগ্মরূপে চিত্রিত হলেও মানবীয়গুণ-সম্পন্না। রোম্যান্টিক মানসের আদর্শলোকের সন্ধান ও অতীন্দ্রিয় মনের ঐকান্তিক সম্ভোগ থাকলেও ঘরের নারী বিহারীলালের সারদা-পরিকল্পনাকে অধিকতর আচ্ছন্ন করেছে। বলা উচিত, বিহারীলালের সারদা মর্ত্যরমনী থেকে সত্যরূপা বিশ্ববাসিনী হয়ে উঠেছেন। বিহারীলাল চেয়েছিলেন অনেককিছু, হয়ত আকাশের চাঁদ ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষিত,—তাই বলে প্রতিদিনের এই চোখে দেখা ধূলিভরা পৃথিবীকে তাঁর নিকট মূল্যহীন মনে হয়নি। মর্ত্যের প্রতি এই স্বাভাবিক মমতা ও আকর্ষণের জন্যই তিনি সারদার মানবীরূপ অঙ্কন করেছেন,

এবং এই রূপায়নে তিনি সার্থক। মরিস মেতারলিংকের Blue Bird-এর মতো বিহারীলালের সারদাও বিশ্বব্যাপিনী সত্তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ও ফরাসী রোম্যাণ্টিক-সাঙ্কেতিকতাবাদী কবিদের মতোই বিহারীলাল তাঁর সারদাকে রক্তমাংসের সজীব সত্তারূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, কায়াকে আশ্রয় করে যেমন সৌন্দর্যের প্রকাশ, তেমনি নির্ভেজাল কায়ারূপিনীও তাকে বলা যায় না, অর্থাৎ সৌন্দর্যের মূর্তরূপ আছে কায়ায়, আর বিমূর্তরূপ প্রকাশিত হয় ছায়ায়। আরও পরিণত ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ মানসিকতার বশবর্তী হয়েই উর্বশীর মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্যের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন।

রোম্যাণ্টিক কবি দূর থেকে এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চান বলেই তাঁর যত সংশয় আর বেদনা,—কিন্তু মিষ্টিক কবির উপলব্ধি একান্ত আত্মগত, নিঃসংশয় তৃপ্তিসম্ভোগে তার কোন বাধা নেই। বিহারীলাল কখনো কখনো মিষ্টিক-চেতনার স্পর্শে আত্মতৃপ্তির আস্বাদ অনুভব করলেও রোম্যাণ্টিক-বিষণ্ণতার সুরই সারদামঙ্গলের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। সেইজন্যেই কবিকে বারবার তৃপ্তির নন্দন-কানন থেকে যন্ত্রণাময় মর্ত্যভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, স্মরণ রাখা দরকার, কবির এই অনুভব কোন পরস্পর বিরোধী মানসিকতার ফল নয়, সংশয় ও অপ্রাপ্তির বেদনায় রোম্যাণ্টিক-মন যেখানে ক্লান্ত ও অবসন্ন, মিষ্টিক-মনের সেখান থেকেই যাত্রা সুরু। রোম্যাণ্টিক-কল্পনার শেষ-সীমান্ত থেকেই মিষ্টিক-চেতনার সীমাহীন আনন্দলোকের স্বাধীন বিচরণক্ষেত্রের সূত্রপাত। বিহারীলাল একই কাব্যে এই দুই জগতে বিচরণের দুর্লভ দক্ষতা দেখিয়েছেন। এই উভয় মানসিকতার সমন্বয়ে তাঁর সারদামঙ্গলকে আলো-ছায়ার এক বিচিত্র আল্পনা বলে মনে হয়। সমকালীন আর কোন অনুরূপ অঙ্কন-দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি।

বিহারীলাল মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নন, তিনি রূপস্রষ্টা শিল্পী। তাঁর কাব্যে প্রেয়সীর সঙ্গে প্রেয়সীর নিঃসর্ত অবলুপ্তি ঘটেছে। ভারতীয় বৈষ্ণব কবি ও সুফী সাধকগণের মতো দাক্ষিণাত্যের আলোয়ার সম্প্রদায়ের সাধকগণের মধ্যে মর্ত্য ও অমর্ত্যপ্রেমের সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মোহিতলাল মজুমদারও পরবর্তীকালে অনুরূপ মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন

বিহারীলাল সারদামঙ্গলের পাঠকের সম্মুখে অজস্র বিস্মিত-চিত্রের

সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কবি এই কাব্যের পাঁচটি সর্গ জুড়ে চঞ্চল পদক্ষেপে চিত্র থেকে চিত্রান্তরে পর্যটন করে বেড়িয়েছেন; কোন একটি ঐক্যবোধে তাঁর কবি-আত্মা স্থির থাকতে পারেনি। বিহারীলালের মর্ত-প্রীতি উনবিংশ শতাব্দীর ঘরমুখী জাতীয়-আকাঙ্ক্ষারই ফল বলে মনে হয়। য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক কবিগণ গৃহাভিমুখীনতাকে কখনো এমন প্রাধান্য দেননি। Wordsworth, Coleridge ও পরবর্তীকালের Mrs. Browning-কে বাদ দিলে ইংলণ্ডের প্রায় সব রোম্যান্টিক কবিই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সন্ধানী। বিহারীলালের গৃহাভিমুখীন মর্ত্যপ্রীতি বারবার তাঁকে মিষ্টিক আনন্দলোক থেকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেছে। শত ব্যর্থতা সত্বেও বিহারীলাল উভয়-প্রকার মানসিকতার সমন্বিতরূপে এক বিচিত্র রসস্রষ্টা অনুপম কবি।

৩

সারদামঙ্গল আপাত দৃষ্টিতে দেবী-বন্দনামূলক কাব্য।

(ভারতীয় সংস্কার ও কল্পনাসূত্রে বাগদেবীর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্য-সংস্কারে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য লক্ষিত হলেও অনার্য-চিন্তায় দেবীকে সমস্ত সৃষ্টির মূল বলে স্বীকার করা হয়েছে। বৈদিককাল থেকে ভারতীয় কল্পনায় সরস্বতীর রূপের যে বিবর্তন চলে এসেছে, বিহারীলালের সারদাকে তারই আধুনিক সংস্করণ বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়।) পরবর্তী কাব্য "সাধের আসন"-এ কবি চণ্ডীর একটি অংশকে সুস্পষ্টরূপে অণুসরণ করে লিখেছেন, "কে তুমি মা কান্তিরূপা প্রাণের প্রাণ" (তু.—'যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেন সংস্থিতা'…ইত্যাদি)। অবশ্য এ সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক এবং আভ্যন্তরীণ, কাব্যের রূপকর্মে এর প্রভাব তেমন অনুভূত হয় না। (কোন সচেতন প্রয়াসের দ্বারা কাব্যরচনা করা বিহারীলালের কবিধর্মের অনুকূল নয়, পৌরাণিক প্রভাব যা কিছু পড়েছে তা একান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে, কবির অলক্ষ্যে।)

(কোন কোন সমালোচক কবির এই সারদা-পরিকল্পনার সাথে Shelley-র অন্তরঙ্গ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।) বিহারীলালের সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এ জাতীয় চিন্তার উৎস-মুখ খুলে দেন। Shelley বিশুদ্ধ আদর্শবাদী কবি, তাঁর Intellectual beauty-র চেতনা বিহারীলালের দোলায়মান কবিচিত্তে স্থায়ী আসন পাতবার কথাও নয়।

বিশেষতঃ মেজাজের দিক থেকে উভয় কবির সঙ্গে মিলের চাইতে অমিলটাই বেশী।

গ্রীক সৌন্দর্যবাদী কবিগণ সর্বপ্রথম বিশ্বকে একটি অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনায় আবৃতরূপে দেখেছিলেন। সৃষ্টির মূলে যে অনন্ত সৌন্দর্যের বাস—তা এই ভাবনার বিভিন্ন স্তরে পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হয়েছে। এই সর্বব্যাপী অনন্ত সৌন্দর্যকে Keats প্রত্যক্ষ করেছিলেন খণ্ডিতের মধ্য দিয়ে, সীমাবদ্ধ দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ পরিসরে। কিন্তু Shelley-র নিকট এই সৌন্দর্যের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই, প্রকার নেই, নাম নেই, সীমা নেই—এমন কি দেশ-কালের বেড়া নেই। প্রতিদিনের এই যে জগৎ তাঁর সম্মুখে প্রসারিত হয়ে আছে—তা তো খণ্ডিত, অর্ধসত্য, নিরানন্দ।—এর বাইরে প্রসারিত রয়েছে অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্যের সীমাহীন আনন্দময় জগৎ। Shelley সেই বৃহত্তর জগতের সন্ধানেই ছিলেন সদাব্যাপৃত। যদিও তিনি জানতেন এই খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ পৃথিবীতে সেই অনন্ত সৌন্দর্যলোকের সন্ধান কোনদিনই মিলবে না। তাকে পেতে হবে অনুভবের মধ্য দিয়ে—তাই তাঁর সৌন্দর্যের প্রতীক বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস—Prometheus Unbound.

বিহারীলালের সারদা সৌন্দর্য ও প্রীতির আধার, কবির মানস-লক্ষ্মী। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করেছেন—"এই মানস সুন্দরী সাধারণতঃ বিহারীলালের কাছে তিনটি রূপে প্রতিভাত হইয়াছে—সৌন্দর্যরূপিনী উর্বশী, মঙ্গল-রূপিনী লক্ষ্মী ও অন্তর্লোক উদ্ভাসনকারিনী সরস্বতী।" কবি তাকে কখনো দেখতে চেয়েছেন সীমাবদ্ধ রূপের মাঝে, আবার কখনো দিয়েছেন সীমাহীন অরূপের মাঝে মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনায় বিহারীলালের এই দ্বৈত-চারনার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সূর্যাস্ত-কালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধরূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।"

রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলকে একটি সম্পূর্ণ কাব্যরূপে স্বীকৃতি দেননি, তিনি কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সমষ্টিরূপেই এর রসগ্রহণ করেছেন। এতদিন লোকে সরস্বতী সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছেন, সারদামঙ্গলে

সেই প্রথাগত ধারণারও সমর্থন নেই।) বিহারীলাল একটি পত্রে স্পষ্টতঃ লিখেছেন, "মৈত্রী বিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।.........গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ববর্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের সরস্বতীমূর্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিতভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য যে এই বিষাদময়ী মূর্তির সহিত বিরহিত মৈত্রী প্রীতির ম্লান করুণামূর্তি মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।"—(অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত পত্র। তারিখ ৪ কার্তিক ১২৮৮)। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সারদার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, ("কবি (বিহারীলাল) যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানাভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।" এদিক থেকে Shelley-র Spirit of Beauty-র সঙ্গে বিহারীলালের সর্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর লক্ষনীয় সাদৃশ্য আছে।)

(তবু বিহারীলালের সারদাকে শেলী-প্রভাবিত কোন চিন্তার ফলশ্রুতি বলে মনে হয় না, একে কবির একান্ত মৌলিক সৃষ্টি বলেই স্বীকার করতে হয়। (বিহারীলালের সারদাকে আমরা দেখেছি কখনো বিশেষরূপে, কখনো নির্বিশেষরূপে। এই পরিকল্পনায় বিহারীলালের মনের তিনটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবহমান ছিল—(এক) কবির মর্ত-ঘনিষ্ঠ রোম্যান্টিক মানস, যার ফলে তিনি সারদাকে বিশেষরূপে আকাঙ্খা করেছেন (দুই) কবির সৌন্দর্যাভিলাষী রোম্যান্টিক-মানস; যার ফলে তিনি সারদাকে অসীম অনন্ত সৌন্দর্যলোকের স্তরে মুক্তি দিয়েছেন (তিন) কবির রহস্যাভিসারী মিষ্টিক-মন; যার ফলে তিনি সারদাকে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীরূপে নির্বিশেষ করে তুলেছেন। কবি-মন এইভাবে ত্রিবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানা-পোড়েনে দোলায়িত বিচলিত হয়েছে। সীমা-অসীমের পারস্পরিক আকর্ষণে কবি-মন বারবার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্থান-পরিবর্তন করেছে। এই পরিবর্তন সতর্ক পাঠকের নিকট সবসময় সহজ-দৃষ্ট নয়।

তাই কব্য-পাঠে পাঠকের মনে যে আবেশময় অনুভূতি জাগে—তার সহজ-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ সারদামঙ্গলের এই বৈশিষ্টটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই মন্তব্য করেছেন, "সমালোচনা-শাস্ত্রের আইনের মধ্য হইতে তাহাকে ছাঁকিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহার অনেক রস বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।" এককথায় সারদামঙ্গল "অপরূপ কাব্য।"

(Shelley-র সৌন্দর্য-চিন্তার সাথে বিহারীলালের সৌন্দর্য-চিন্তার বিস্তর প্রভেদ আছে। বিহারীলালের সারদা বিশ্বব্যাপিনী, সৌন্দর্য-সৃষ্টির মর্মমূলে বিরাজিতা; কিন্তু Shelley-র Spirit of Beauty-র চিন্তা বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি তত্ত্বমাত্র, অনন্ত সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা তার প্রধান লক্ষন। বিহারীলাল সৌন্দর্যরূপিনী সারদাকে পেয়েছেন সান্ত ও অনন্তের হৃদয়গত অনুভবের মধ্যে, তিনি স্নেহে প্রেমে করুণায় মানবীরূপে কবির অন্তরঙ্গ প্রনয়িণী। Shelley জার্মান ভাববাদ ও উইলিয়াম গডউইনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৌন্দর্যকে খণ্ডতা-নিরপেক্ষ অখণ্ড-সৌন্দর্যের তাত্ত্বিক মহিমা দান করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ Shelley-র সাথে বিহারীলালের যে সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন—তা নিতান্তই আকস্মিক এবং বহিরঙ্গীয়। বিহারীলাল খণ্ডের মধ্যেও সেই সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই তাঁর সারদা একই সঙ্গে বাস্তবের সৌন্দর্য-সহচরী এবং অলৌকিক বিচিত্ররূপিনী রহস্য-গভীর দুর্নিরীক্ষ্য সত্তা। মানব-হৃদয়ের যে একটি দ্বিতীয় সত্তা বা Second self আছে তা Shelley-র নিকট ছিল অবিশ্বাস্য, কিন্তু বিহারীলালের কবি-মানসে সেই বিশ্বাসের বিচিত্র তরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে গেছে।) কবি-মানসের এই গঠন-গত ব্যবধানের জন্যেও উভয় কবিকে একই মানদণ্ডের নিরিখে বিচার করা যায় না। (বিহারীলালের কবি-মানস অংশতঃ স্বর্গের ও অংশতঃ মর্ত্যের সুষমা-সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর সারদা তাই কোন আরোপ সবস্ব তত্ত্ব নয়, কবির "স্বানুভব সত্য।")

পূর্বেই বলেছি, সারদামঙ্গলের প্রথম চারিটি শ্লোকে কবি সরস্বতীর একটি রূপ-চিত্র অঙ্কণ করেছেন। বাল্মীকির তপোবনে তিনি করুণারূপিনী, অন্ধকার রাত্রির দৃশ্যপটে তাঁর আবির্ভাব। পরবর্তী সর্গগুলিতে এই দেবী কবির প্রণয়িনী-রূপে কখনো ধরা দিচ্ছেন আবার কখনো তিনি অ-ধরা, কখনো অভয়া, কখনো সংহারিণী, কখনো আনন্দময়ী, কখনো বিষাদিনী কখনো অভিমানিনী। এই বিচিত্র ভাব-প্রবাহে কবির স্বগতঃ সঙ্গীত শতধারে

উচ্ছ্বসিত। অবশেষে, এই বিরহ-বিষাদ-সংশয়ের জোয়ার-ভাটার অবসানে দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে কবি প্রনয়িণীরূপে হিমালয়ের পটভূমিতে সারদাকে লাভ করলেন। ভারতীয় সাহিত্যে প্রেম ও সৌন্দর্য চেতনার এরূপ অভিব্যক্তি আর কখনো দেখা যায়নি।) বিহারীলালও এ সম্পর্কে বহু-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অনাথবন্ধু রায়কে লিখিত পত্রের শেষাংশে সে সংশয়ের স্বীকৃতি আছে, "সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদিসম্মত কথা কহিতে হয়।" এই "অসর্ব্ববাদিসম্মত" প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রথম বার্তাবহ বিহারীলাল; স্ব-ভাবে ও চিন্তায় বাঙলা রোম্যান্টিক গীতিকবিতার উদগাতা—যথার্থই "ভোরের পাখি।" বিহারীলালের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে.—"বিহঙ্গম, খুলে প্রাণ, ধরো রে পঞ্চম তান, সারদামঙ্গল গান গাও কুতূহলে।"

৪

একালের একজন বিশিষ্ট সমালোচকের মতে, বিহারীলালের কাব্য "অমার্জিত হীরকখণ্ডের মতো" সহজ সৌন্দর্যের আধার। সারদামঙ্গল বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক ত্রিপদী ছন্দে রচিত, কোন প্রকার চেষ্টাকৃত শিল্প-সৃষ্টির পরিচয়ও এ কাব্যে একান্ত দুর্লক্ষ্য।) রবীন্দ্রনাথও বিহারীলালের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন, "সাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারী-লালের আর-একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা।" (বিহারীলাল একান্ত নিভৃতে বসে আপন মনে গান গেয়েছেন, সে সঙ্গীত অনেকটা প্রবহমান ঝরণার মতো উচ্ছল ও বিনীত। তাঁর ভাষায় যে ত্রুটী লক্ষ্য করা যায়, তা কবির অক্ষমতাজনিত অপরাধ নয়—সরল প্রাণের সহজ অভিব্যক্তির অনিবার্য দোষ।) যদিও তাঁর "ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট ও কর্ণপীড়ক হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে" তথাপি তা মনোরম ও হৃদয়-গ্রাহী। বরং অসতর্ক কাব্যকারের এই ত্রুটীগুলি তাঁর আন্তরিকতাকে অধিকতর প্রতিষ্ঠা দান করে।

বিহারীলাল কাব্য রচনা করেছেন হৃদয়ের অনুভব ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। ভাবকে কাব্যরূপে প্রকাশ করতে গেলে তাকে যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা কিছুটা মার্জিত করে নিতে হয়, সমালোচকের

ভাষায় যাকে 'Selection' বলা হয়, বিহারীলালে তার একান্ত অভাব। কবি অনেক সময় অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রাধান্য দিয়ে কাব্য-রসকে আহত করেছেন।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "Poetic genius is the power of seeing and communicating certain kinds of truth by embodying in concrete ideas," এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিহারীলালকে বিচার করতে গেলে সমালোচককে বিব্রত হতে হবে। বস্তুতঃ প্রকাশিত কাব্যের বিচারে বিহারীলালের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হবে না। একজন প্রাচীনপন্থী সমালোচক একদা বলেছিলেন—"বিহারীবাবু সর্বদা কবিত্বে মজগুল থাকিতেন, তাঁহার হাড়ে হাড়ে, প্রাণে প্রাণে, কবিত্ব ঢালা থাকিত; তাঁহার রচনা তাঁহাকে যত বড় কবি বলিয়া পরিচয় দেয়, তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কবি ছিলেন।"—বিহারীলাল সম্পর্কে সমালোচকের এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। বিহারীলাল কাব্য-রচনা করতে বসে ভাবকে সংযত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কোথাও চিন্তা প্রকাশের অস্পষ্টতায় ও ছন্দের দৌর্বল্যে পাঠকের মন ও কান পীড়িত হয়। সেইজন্য বিহারীলালের কবি-মানসের স্বরূপ জানতে হলে সমালোচককে ভিন্নপথের সন্ধান করতে হবে।

প্রাক-রবীন্দ্র এবং রবীন্দ্র-যৌবন-সমকালীন প্রায় সব কবিই বিহারীলালের দ্বারা অশেষ-ভাবে ও রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রাক-মানসী পর্বের রবীন্দ্র রচনাবলীতে বিহারীলালের স্পষ্ট স্বাক্ষর অঙ্কিত। বিহারীলালের 'সারদা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' প্রকৃতপক্ষে একই ভাবনার দ্বৈত-রূপ মাত্র; অন্তরঙ্গসূত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতাকে বিহারীলালের সারদারই মার্জিত সংস্করণ বলে স্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ জগতের মাঝে যে 'বিচিত্ররূপিনী'-র সন্ধান করে বেড়িয়েছেন, "অন্তর মাঝে" যে "অন্তর ব্যাপিনী"-কে নিরন্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন—তার জন্য বিহারীলালেরও কম ব্যাকুলতা ছিল না। বিহারীলালের সারদা মর্ত্য-প্রাঙ্গনের "গৃহের বণিতা"-ই রয়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রিয়ার মতো "বিশ্বের কবিতা" হয়ে উঠতে পারেনি। কবি-মানসের গোপন অন্তপুরে কল্পনার সকল আয়োজন বিহারীলালেরও ছিল, কিন্তু তখনও সে-আয়োজন ছিল রেশমের কোমল-কঠিন আস্তরণে আবদ্ধ, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের

প্রতিশ্রুতি নিয়ে অর্ধ-প্রকাশ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতর উপলব্ধির জন্য সে-সম্ভাবনা ছিল অপেক্ষমান। বিহারীলালের কবি-কল্পনায় আকাশ-স্পর্শী চিন্তার ব্যাকুলতা, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য আকাঙ্ক্ষার যে সুর স্পন্দিত হয়েছিল, কাব্যরূপে তার প্রকাশ ঘটেনি। প্রকাশ-সামর্থের ওপর কাব্যের শিল্প-সৌন্দর্য নির্ভরশীল, কবির ধ্যান-চিন্তার ওপর নয়। বিহারীলাল অন্তর্মুখী ধ্যান-চিন্তনে ছিলেন অকৃত্রিম, কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্ধবিকশিত। যে অনুশীলনের ফলে কল্পনা কাব্য হয়ে উঠতে পারে, বিহারীলাল সে ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন এবং অসতর্ক। সহজাত আবেগের তাড়নায় তিনি কাব্য-রচনা করেছেন, শিল্পীর সচেতনতা নিয়ে কলম ধরেননি। একালের একজন বিশিষ্ট সমালোচক আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন "সার্থক শিল্প রচনার ক্ষেত্রে যে পরিমার্জনা ও সতর্কতার প্রয়োজন তার চিহ্ন তাঁর কবিতায় নেই। অনেকসময় কলাকৌশলহীন ভাষণই তাঁর লেখনীমুখে স্বতোসারিত হয়েছে। এ যেন এক বিচিত্র-কীর্তি সাহিত্যিক অভিমন্যু, যিনি অনায়াসে ব্যূহ ভেদ করেন, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ জানেন না।"

অবশ্য এ দোষ বিহারীলালের একার নয়, সমকালীন রোম্যান্টিক প্রায় সব কবিই যুগ-মানসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যের প্রকাশ-গাম্ভীর্যের পাশে রোম্যান্টিক ভাব-ধারার অস্পষ্ট ব্যাকুলতাকে সার্থক কাব্য-সৌন্দর্যে প্রকাশ করার শিল্প-সামর্থ তখনও কোন কবিই অর্জন করতে পারেননি। অবশ্য অসীম অনন্তলোকের রহস্যময় cosmic imagination-কে সার্থক বাণীরূপ দেবার মতো শব্দ-সৃষ্টির প্রতি বিহারীলালও ছিলেন নিতান্ত অসতর্ক। বিহারীলালের সৌন্দর্য-চেতনার প্রাথমিক সূত্রপাত বঙ্গসুন্দরীতে হলেও সারদামঙ্গলেই তার ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সাধের আসনে এসে কবি-চেতনা ক্রম-জটিলতার পথে এসে আত্মহারা হয়েছে।

রেখে ঢেকে কথাবলার চেষ্টাকৃত-কলাকৌশল বিহারীলালের ছিল অনায়ত্ত। তিনি সারদামঙ্গলে কথাভাষায় প্রচলিত বহু শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। মনের ভাবের প্রতি কবির যতখানি ব্যাকুলতা, মুখের ভাষায় প্রতি ততখানি অবহেলা। থুয়ে, মাজে, উথুলে, ববে, দেকে, চোলে, জ্বোলে, সুহু, ধোরে, কোরে, বোকে বোকে, অবমান প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে কবি কোন প্রকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে

পারেননি। বরং এসকল শব্দের ভিন্নরূপ একই সঙ্গে প্রয়োগ করে কারু-কর্মে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন। কাব্যমধ্যে উক্তশব্দ সমূহের কোন কোনটির রূপ—মাঝে, উথলিয়া, বহিবে, চোখে, চলে, জলে, সুধু, ধরে, করে, বকে বকে, অপমান—প্রভৃতিও কচিৎ চোখে পড়ে। বস্তুতঃ সারদামূর্ত্তি-কল্পনায় কবি-চিত্তে যে বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল—তাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করবার শব্দ ও শিল্প-সামর্থ কবির ছিল না। সারদার রূপদর্শনে কবি-মনে যে ব্যাকুলতা জেগেছে, তাঁকে ভাষারূপ দিতে কবি ততখানি সচেতন হননি—"একি, একি কেন কেন, রসাতলে যাই যেন!…………" ইত্যাদি পংক্তির মতো নিস্তব্ধ নিশুতিরাতের বর্ণনায় কবি "রাতি করে সাঁই সাঁই, জনপ্রাণী জেগে নাই" প্রভৃতি দুবল পংক্তির ব্যবহার করেছেন। কখনো কখনো গুরুতর মানসিক-চাঞ্চল্যের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে কবি ছড়ার ছন্দের চটুল ব্যবহারে করেছেন। ফলতঃ কবির অতীন্দ্রিয়-চেতনা ছন্দের ঠুংঠুং আওয়াজে কাচের পেয়ালার মতোই ভেঙে খান খান্ হয়েছে।

অবশ্য কাব্যবিচারে অনেক সময় এরূপ মন্তব্য অত্যন্ত কঠোর মনে হতে পারে। কারণ সারদামঙ্গলে এমন কতকগুলি পংক্তি রয়েছে যা সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠকবির শিল্প-সৃষ্টি রূপে অভিনন্দিত হবার মতো। উষা ও সন্ধ্যা বর্ণনায় কবি যে রূপ-অঙ্কন করেছেন, তা ক্ষণস্থায়ী হলেও অনুপম। রোম্যান্টিক কাব্যের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীদের নির্মিত একটা পথের রেখা দেখতে পেয়েছিলেন—কিন্তু বিহারীলালের নিকট সে পথেরও কোন সন্ধান জানা ছিলনা। বিহারীলাল স্বীয় পথে পদচারণা করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের ঋণ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। বহু দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও নতুন সুরের প্রবর্তক হিসেবে তিনি বাঙলা কাব্যজগতের গুরু এবং চিরনমস্য হয়েই থাকবেন।